প্রকাশক :
শ্রীকমলেন্দু সাঁতরা
বাবা তারকনাথ পুস্তক ভাণ্ডার
অযোধ্যা (বেল পুকুর), হাওড়া

প্রকাশ : ১৫ই আগস্ট, ১৯৫৯

মুদ্রাকর :
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

আমার প্রথম গবেষণার কাণ্ডারী
প্রয়াত ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের
পবিত্র স্মৃতিতে—
আগামী দিনের গবেষকদের হাতে
বইটি সস্নেহে উপহার দিলাম।

ভূমিকা

সাহিত্য-গবেষণাকে কেন্দ্র করে একটি বই লেখার ইচ্ছে অনেক দিন থেকেই ছিলো। অ্যাকাডেমিক প্রয়োজনের কথা না ভেবে নিতান্ত গবেষণার জগৎকে ভালোবেসে বইটি এই খসড়া আকারে লেখা অবস্থাতেই পড়ে ছিলো। কয়েকজন তা জানতেনও। বর্তমানে প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় তাঁদের অনুরোধেই এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে বাধ্য হলাম। আলোচনাগুলি ইচ্ছাকৃত ভাবেই সংক্ষিপ্ত রাখা হলো।

পদ্ধতি ও প্রয়োগের প্রসঙ্গে কিছু অন্য কথাও এসে পড়েছে। অন্যত্র বলবার অবকাশ না থাকায় সাময়িক সংযোজন হিসেবে এই গ্রন্থেই তা প্রকাশ করতে হলো। একটিই মাত্র উদ্দেশ্য,—গবেষক, গবেষণা ও গবেষণার পরিবেশকে আরো উন্নত করা, আরো সুন্দর করে তোলা; কাউকে আঘাত করা নয়। গ্রন্থের পরিশেষে—মৌখিক সাহিত্য-গবেষণা, পুঁথি গবেষণা ও সাধারণ সাহিত্য-গবেষণার নমুনা-স্কীম দেবার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও নিয়মগত কয়েকটি অসুবিধা থাকায় তা দেওয়া সম্ভব হলো না।

এই গ্রন্থ প্রকাশের বিষয়ে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী যিনি, আমার সেই শিক্ষাগুরু ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ঋণ স্বীকারের অর্থ তাঁকে অমর্যাদা করা। প্রীতিভাজন অধ্যাপক ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিকের উৎসাহদানকেও এই সঙ্গে স্মরণ করি।

উদ্দেশ্য সফল হওয়ার মধ্যেই গ্রন্থকারের আনন্দ, অন্য কোনো প্রত্যাশা নেই।

জয়ন্ত গোস্বামী

বিষয় সূচী

সংশোধনী :

(যথাক্রমে পৃষ্ঠা, পঙ্‌ক্তি, অশুদ্ধ ও শুদ্ধপাঠ নির্দেশিত হলো।)

২৫/৯ —পদ্ধতি বিজ্ঞান—পদ্ধতি-জ্ঞান

২৮/২২—পুস্তিকা—পুষ্পিকা

৩৫/১১—লোক—লোকসঙ্গীত গায়ক

৩৫/১২—সঙ্গীতগায়ক—(বর্জিত)

৫৭/১ —(বর্জিত)—১৫শ ১৬শ শতকের পুঁথির হরফ

৭০/২২—করতে পারেন—করতে না পারেন

৮১/২৬—এতো—এতে

৮২/৩ —বহু বই—বই বন্ধ

৮৩/২৫—মুড়ে—যুড়ে

প্রথম পর্যায়
(TEXT)

১. গবেষণা : সাহিত্য-গবেষণা

গবেষণা : যুগ যুগ ধরে মানুষ তার জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে সব কিছুতেই অনিত্যতা উপলব্ধি করেছে। অন্যদিকে নিত্যতার প্রতি আকর্ষণ মানুষের সহজাত। তাই পরিবর্তনশীল বস্তু ও চেতনার মধ্যে মানুষ একটা স্থিতিশীল রূপকে অবলম্বন করতে চায়। আবার তারই সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার চেতনাকে প্রসারিত করে একটা তত্ত্বের মধ্য দিয়ে মনের সামঞ্জস্য রক্ষা করবার চেষ্টা করে। তাই ব্যক্তি-অস্তিত্বের মৃত্যু অবধারিত জেনেও মানুষ জাগতিক বস্তুর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে এবং বর্তমান-চেতনায় তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়। এই একই প্রবণতা তেমনি অতীত বস্তুর সংরক্ষণ ও ভবিষ্যৎকে উপলব্ধির চেষ্টা করে থাকে। এই প্রবণতা থেকেই মানুষের মনে গবেষণার প্রবণতা জন্মগ্রহণ করেছে। তাই একদিক থেকে মানুষ মাত্রেই 'গবেষক'।

'গবেষণা' শব্দটির একটি লৌকিক প্রয়োগ আছে। এর অর্থ উদ্দেশ্য-মূলক চিন্তাভাবনা। আবার অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে 'গবেষণা' শব্দটি ব্যবহার করা হয় বিশেষ এক ধরনের কাজের ওপরে। দ্বিতীয় প্রয়োগটিকে কেন্দ্র করেই আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। অবশ্য মূল প্রবণতার মধ্যে ভিন্নতা নেই।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই 'গবেষণা' শব্দটির প্রয়োগ আমরা লক্ষ্য করে থাকি। 'গবেষণা' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন আভিধানিক অর্থের সামগ্রিক বন্ধনসূত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রয়োগ-গত লক্ষ্যস্থল আবিষ্কার করা সম্ভব।

'গো (গম্+ও)+এষণ' থেকে শব্দটির সৃষ্টি। 'গো' শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিচিত্র। বিচিত্র অর্থগুলির মধ্য থেকে অর্থের নির্যাস আবিষ্কারের চেষ্টা করা যেতে পারে। অভিধান অনুসারে 'গো' শব্দের মোটামুটি স্থূল অর্থগুলি :—পশু বিঃ, যাগ বিঃ, ঋষি বিঃ, চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, কিরণ, জল, বাণ, স্বর্গ, ভূমি, মাতা, বাণী, বাক্য, চক্ষুঃ, দৃষ্টি, ইন্দ্রিয়, কেশ, গায়ত্রী, দিক্ ইত্যাদি। শব্দগুলিকে ব্যুৎপত্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে এইভাবে পদক্ষেপ করা যায়।—

দিক্ অন্বেষণ > মানস-জগতে দিক্ অন্বেষণ > মানস-জগতে গন্তব্যক্ষেত্র স্থির করে দিক্ অন্বেষণ > একটি উদ্দেশ্য অন্তরে বহন করে মানস-জগতে গন্তব্যক্ষেত্র স্থির করে দিক অন্বেষণ।

তথ্য ও তত্ত্বকে কেন্দ্র করে সংশ্লেষণ-চেতনা ও বিশ্লেষণ-চেতনার মাধ্যমে মানুষ গবেষণায় পদক্ষেপ করে। এই সময়ে পাঁচটি ধারণা মানুষের মনের মধ্যে সক্রিয় থাকে।

ক. ভ্রান্তি

খ. সত্যের আভাস

গ. ভ্রান্তি ও সত্যের ছেদরেখা

ঘ. ভ্রান্তি থেকে সত্যে উত্তরণের পথ

ঙ. সত্যের প্রত্যয়

দ্বন্দ্ব সর্বদাই ধারণাকে অস্বচ্ছ রাখে। এই অস্বচ্ছতার সঙ্গে অনুসন্ধিৎসা গবেষক-মনকে সক্রিয় রাখে। মনের বলিষ্ঠতা মানস-জগতে সুস্থতার সহায়ক হয়। নইলে বলিষ্ঠতার অভাব-জনিত মানসিক জটিলতা মানুষের চেতনাগত সুস্থতা নষ্ট করে। এই জটিলতার পরিণাম নৈরাশ্যবাদ।

তত্ত্ব ও তথ্যের উপলব্ধির ক্ষেত্রে দুটি পথ আছে।—

ক. তথ্যের তত্ত্বরূপে পদক্ষেপ

খ. তত্ত্বের তথ্যে রূপায়ণ

গবেষণায় এই দুটি পথ যথাক্রমে আরোহ ও অবরোহ।

অ্যাকাডেমিক গবেষণাও অনাধুনিক। তবে আধুনিক ধরনের অ্যাকাডেমিক গবেষণা বয়ঃকনিষ্ঠ। মানুষের সীমিত ক্ষমতা, বৃহত্তর পরিধি-চেতনা, কর্তব্যবোধ ইত্যাদি অ্যাকাডেমিক গবেষণায় মানুষকে নিয়োজিত করেছে। অ্যাকাডেমিক গবেষণার মাধ্যমে স্থানের পরিধি, কালের পরিধি এবং পাত্রের পরিধির বিস্তার ঘটে। গবেষণার পদ্ধতির উন্নয়ন, মানের উন্নয়ন, অধিক সোপান অতিক্রম অ্যাকাডেমিক গবেষণার মাধ্যমে সম্ভবপর হতে পারে।

তবে যুগে যুগে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে কিংবা অঞ্চলে অঞ্চলে

অ্যাকাডেমিক গবেষণার মধ্যে পার্থক্য এসে যেতে পারে। এর কারণ আছে। অর্থনৈতিক অবস্থা, বিজ্ঞান চেতনার বিশেষ অবস্থা, বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব-আপোষ রাজনৈতিক-সামাজিক-ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ,—এমন কি সামগ্রিক অবক্ষয়ও অ্যাকাডেমিক গবেষণাকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

বর্তমান অ্যাকাডেমিক গবেষণায় ডিগ্রী, সম্মান বা অর্থ পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়ে থাকে গবেষকের সফলতায়। সুতরাং গবেষণার ক্ষেত্রে উপায়ের চেয়ে উপেয় অর্থাৎ পুরস্কার-লাভ বড় হয়ে ওঠে। এর ফলে অ্যাকাডেমিক গবেষণার সুফলের পাশে কুফলও লক্ষ্য করা যায়।

অ্যাকাডেমিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাথমিক দিক থেকে কিছু আনুকূল্য প্রয়োজন।

ক. যথার্থ গবেষক নির্বাচন
খ. গবেষকের তথ্যগত চাহিদা পূরণে সংস্থার সহায়তা
গ. গবেষকের তথ্যগত চাহিদা পূরণে বিশেষজ্ঞের সহায়তা
ঘ. গবেষকের অন্যান্য শ্রম লঘুকরণ ব্যবস্থা
ঙ. গবেষকের মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যরক্ষায় আনুকূল্য
চ. আর্থিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সহায়তা
ছ. চিন্তা ও কর্মে গবেষককে স্বাধীনতা দান

যথার্থ গবেষক নির্বাচন শুধুমাত্র পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রদের প্রাপ্ত নাম্বারের ভিত্তিতে সম্ভব নয়। কারণ বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে কৃতিত্ব ছাত্রের জ্ঞানের পরিমাপ নয়। ছাত্রদের দ্বারা প্রকাশিত কিছু মৌলিক প্রবন্ধ এবং বিশেষ বোর্ডের সঙ্গে সে বিষয়ে ছাত্রদের আলোচনার মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে গবেষক মনোবৃত্তি আছে কিনা, তার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

গবেষকের তথ্যগত চাহিদা পূরণে সংস্থাগুলির সহায়তার প্রয়োজন ঘটে। সরকারী সংস্থা, বেসরকারী সংস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সহযোগিতায় গবেষকরা বিভিন্ন দিক থেকে তথ্য আহরণ করতে পারেন। অনেক সময় আমলাতান্ত্রিক অসুবিধাগুলি গবেষককে নিরুৎসাহী করে তোলে এবং গবেষণার ক্ষতি করে থাকে।

গবেষকের তথ্যগত চাহিদা পূরণে বিশেষজ্ঞের সহযোগিতার দরকার হয়। বিশেষজ্ঞদের মনে রাখা উচিত যে, কারো গবেষণায় সহায়তা করার অর্থ কোনো ব্যক্তিকে সহায়তা করা নয়,—সমাজকে সহায়তা করা এবং তার মাধ্যমে মানব জাতিকে সহায়তা করা। তত্ত্বাবধায়কের উচিত, অন্য কোনো বিশেষজ্ঞের কাছে প্রয়োজনবোধে গবেষক যাতায়াত করলে অসন্তুষ্ট না হওয়া। এই জাতীয় স্বাধীনতা গবেষকদের যেমন থাকবে, তেমনি বিশেষজ্ঞরাও তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ককে ভিত্তি করে গবেষকের সঙ্গে আচরণ করবেন না—গবেষককে সহায়তা তাঁদেরও নৈতিক দায়িত্ব।

অনেক সময়েই আমরা দেখি যে, গবেষক অন্য কাজে নিযুক্ত থাকতে বাধ্য হন জীবিকার প্রয়োজনে। এতে গবেষণার সময় যেমন সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়, তেমনি অভিনিবেশেরও অভাব ঘটে। তাই গবেষকের অন্যান্য শ্রম লঘুকরণের ক্ষেত্রে সর্বদিক থেকেই সহযোগিতার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

গবেষণার ক্ষেত্রে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করতে হয়। এজন্য স্নায়বিক সুস্থতার প্রয়োজন। অনেক সময় অনেক গবেষককে নানান কারণে বিভিন্ন অশান্তিতে ভুগতে হয়। এই অশান্তি মূলতঃ তাঁর গবেষণাকে কেন্দ্র করেই যেখানে ঘটে, সেখানে তার নিরসন ঘটানো সকলেরই নৈতিক কর্তব্য।

গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজে অর্থের প্রয়োজন ঘটে। গবেষকের পক্ষে নিজস্ব অর্জিত অর্থ থেকে সর্বদা এই খাতে ব্যয় করা সম্ভবপর হয় না। অনেক সময় গবেষকের উৎসাহ এবং সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও নিতান্ত আর্থিক কারণেই গবেষণার কাজ আর শেষ হয় না। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—যে কোনো পক্ষ থেকেই গবেষণার ক্ষেত্রে আর্থিক দায়িত্ব স্বীকার করে নিলে অনেক অসম্পূর্ণ গবেষণা শেষ হতে পারে; এই দৃষ্টিভঙ্গী নতুন গবেষককেও উৎসাহিত করতে পারে।

গবেষণার ক্ষেত্রে চিন্তা ও কর্মে গবেষকের স্বাধীনতা ভোগের

প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রেই তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে গবেষকের মতভেদ হতে পারে। এক্ষেত্রে গবেষকের ওপরে চাপসৃষ্টি করা অনুচিত। আবার বাইরের থেকে সামাজিক, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক চাপসৃষ্টিও অনুচিত। চিন্তা ও কর্মে পরাধীনতা যে মানসিক ক্ষোভ আনে, তা গবেষককে নিরুৎসাহী করে তোলে এবং গবেষণার স্বচ্ছন্দগতি নষ্ট করে।

সাহিত্য-গবেষণা : ভাবকে কোনো-কিছুর মাধ্যমে সুন্দর করে রূপ দেবার প্রচেষ্টার ফলেই শিল্পের জন্ম হয়। ভাষাকে যখন মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তখন তাকে আমরা বলি সাহিত্য। সৃজন-বেদনা, ভাব-সন্ধান, ভাব-নির্বাচন, ভাব-উপস্থাপন, সামাজিকতা-বোধ, শব্দ-চেতনা, বিন্যাস-চেতনা ইত্যাদি সাহিত্য-শিল্পীর দায়। অন্য দিকে পাঠকেরও দায় থাকে। যোগ্যতা অর্জন, চিত্তে প্রতিক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া-বিশ্লেষণ ও রহস্য অনুধাবন-প্রচেষ্টা, এই অনুধাবন-প্রচেষ্টার সূত্রে সৃষ্টি-রহস্য অনুধাবন-প্রচেষ্টা—ইত্যাদি বিভিন্ন দিক নিয়ে বহুদিন থেকেই অনুসন্ধিৎসা ছিলো। অন্যদিকে সাহিত্যস্রষ্টা ও সৃষ্টির ধারাবাহিক ইতিহাস, পূর্ববর্তী সাহিত্যিকের প্রভাব-বিচার, পরিবেশগত প্রভাব, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্ব-বিচার--ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহ এসেছে। তাছাড়া সাহিত্যের সূত্রে সাহিত্যিকের জীবন বিশ্লেষণও এই আগ্রহগুলির অন্তর্ভুক্ত। অতীতের বিলুপ্ত সাহিত্যিক ও সাহিত্যঘটিত উপাদান উদ্ধার প্রচেষ্টা, ভবিষ্যতের প্রবণতা সম্পর্কে আলোচনা, স্থান-গত বিচারে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের তুলনামূলক আলোচনা, সাহিত্যচেতনার গতিপ্রকৃতির তুলনামূলক বিচার, সাহিত্য-তত্ত্বের তুলনামূলক বিচার ইত্যাদি বিষয়ও সাহিত্যগবেষণার অন্যতম। সাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে অন্যান্য শিল্পের বিচার তো আছেই। সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের বিচারও নতুন কিছু নয়।

সাহিত্যের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের গভীর সম্পর্ক আছে। কারণ সাহিত্য মনেরই ফসল। মনোবিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কারগুলির প্রভাব সাহিত্য গবেষণায় এসে যাচ্ছে। তাছাড়া [illegible] আবিষ্কারে প্রবর্তিত যন্ত্রগুলির সহায়তা সাহিত্য-গবেষণার কাজে আসছে। টেপ-

রেকর্ডার, ক্যামেরা, কম্পিউটার ইত্যাদি এখন সাহিত্য গবেষণায় সহায়তাকারী। Microphotography (Microfilm, Microfiche) আধুনিক সাহিত্যগবেষণায় গবেষকদের নিত্য সঙ্গী। শুধু কাগজ নয়, Micro card বা Microfilm-এ ধরে রাখা তথ্য, *Audio Visual Documents* *আধুনিক সাহিত্য গবেষণায়* বিজ্ঞানের সহায়তারই স্বাক্ষর।

অন্যদিকে অর্থবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদির নব নব আবিষ্কার এমন কি গণিতশাস্ত্র, পরিসংখ্যান তত্ত্ব, তথ্যবিজ্ঞান—ইত্যাদি কোনো কিছুই এখন সাহিত্য গবেষণায় অপ্রয়োজনীয় নয়।

আবার যেহেতু মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শারীর-বিজ্ঞানের সম্পর্ক গভীর, তাই শারীরবিজ্ঞান সংক্রান্ত আবিষ্কার—এমন কি আনুষঙ্গিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার আগামীদিনে অস্বাভাবিক নাও হতে পারে। একটি সাহিত্যসৃষ্টি বিভিন্ন বৃত্তির মানুষের মনে, শারীরিক বিভিন্ন অবস্থার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ধরনের সংস্কারবাহী মানুষের ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া করতে পারে, তা কোনো একদিন Subjective ক্ষেত্রে হয়তো সীমিত থাকবে না। শারীর-বিজ্ঞানে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের প্রবাহ-পরিলেখ বা পরিমাপ-পরিলেখ যন্ত্রের সাহায্যে objective ভাবে নির্ণয় করাও হয়তো বা সম্ভবপর হবে।

গবেষণায় Back up Service-এর প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না, তবু গবেষণার ক্ষেত্রে যতোটা সম্ভব স্বয়ংনির্ভরতার জন্য আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজী সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। প্রত্যক্ষ সংযোগ ও মাধ্যমের মধ্যে পার্থক্য থেকেই যায়। বিশেষ করে সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে এটা আরও স্পষ্টভাবে দেখা দিতে পারে।

বস্তুতঃ বিশেষ মানসিকতা নিয়ে ব্যক্তি ও সংস্থার সহযোগিতায় বস্তু ও ভাব বা চিন্তার সান্নিধ্যে কতকগুলি স্তরকে অতিক্রম করে গবেষণা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হয়। বস্তুতঃ যে কোন গবেষণাই মানবজাতির সম্পদ। যা সিদ্ধান্ত, পরবর্তীকালে তা পদক্ষেপ হিসেবেই নতুন নতুন সিদ্ধান্তের পথে মানবজাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। মননশীল মানুষ এইভাবেই গবেষণার মাধ্যমে মানবজাতির সেবা করে যাবেন।

২. গবেষক : সাহিত্য-গবেষক

গবেষক : দার্শনিকভাবে হয়তো বলা যায়, মানুষ মাত্রেই গবেষক। কিন্তু সত্যিকারের গবেষক বলতে যাঁদের বুঝি, পৃথিবীতে তাঁরা বিরল,—এরকম উক্তিও অনেকে করে থাকেন। আমাদের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে হবে বাস্তব ভাবে। অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে তাঁরাই গবেষক, যাঁরা কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে মৌলিক তত্ত্ব বা তথ্য তুলে ধরার পথে পদক্ষেপ করেন।

গবেষকদের বিভিন্নভাবে শ্রেণীভুক্ত করা যায়। প্রধানতঃ গবেষকরা দুই ভাগে বিভক্ত :—

ক. অধীন গবেষক
খ. স্বাধীন গবেষক

যাঁরা তত্ত্বাবধায়কের অধীনে কোনো বিষয়ে গবেষণা করে থাকেন, তাঁরা অধীন গবেষকের গোত্রে পড়েন। গবেষকরা তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশে কাজ করেন। তবে গবেষণার কাজটি মূলতঃ করেন গবেষক। স্বাধীন গবেষকদের কোনো তত্ত্বাবধায়ক নেই। তাঁরা স্বাধীনভাবেই কাজ করে থাকেন।

শুধু অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রেই অধীন গবেষকরা থাকেন। তবে স্বাধীন গবেষকরা অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রের বাইরেও কাজ করে থাকেন।

গবেষণার প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে গবেষকদের আবার তিনটি শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে।—

ক. তত্ত্বান্বেষী গবেষক
খ. তথ্যান্বেষী গবেষক
গ. উভয়ান্বেষী গবেষক

যে গবেষকের মূল লক্ষ্য তত্ত্ব, তাঁরা তত্ত্বান্বেষী গবেষক; যে গবেষকের মূল লক্ষ্য তথ্য, তাঁরা তথ্যান্বেষী গবেষক; এবং, যে গবেষক তত্ত্ব ও তথ্য—উভয়কেই গবেষণার মূল লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছেন, তাদের উভয়ান্বেষী গবেষক বলা যায়।

আমরা আমাদের জ্ঞানকে কতকগুলি ছকে ফেলে এক একটি Subject-এ ভাগ করেছি। ইতিহাস, দর্শন, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি পঠনপাঠনের সূত্রে আমাদের কাছে পরিচিত। এগুলি ছাড়াও অনেক Subject আছে— যার খবর সাধারণ মানুষের জানা নেই। আবার এই সব Subject ভেঙে যেমন ছোটো ছোটো নতুন নতুন Subject হয়েছে, তেমনি আবার একাধিক Subject-এর বিষয় মিশিয়েও নতুন Subject হয়েছে। সুতরাং এই Subject-গুলির গবেষণায় প্রকৃতিগত ভিন্নতা থাকবেই। তাই সেইভাবে গবেষকদেরও ভাগ করা যায়।

কোনো কোনো Subject-এর অ্যাকাডেমিক শিক্ষায় Practical Course থাকে। সুতরাং সেই জাতীয় Subject-এর গবেষণায় ল্যাবরেটারি ইত্যাদির প্রয়োজন আছে। ফিল্ডওয়ার্ক-ভিত্তিক Subject-এর গবেষককে ফিল্ডওয়ার্ক করতে হয়। এই জাতীয় গবেষণা ও গবেষকদের শ্রেণীভেদ অসংখ্য। সাহিত্য-গবেষক এই জাতীয় বিভিন্ন শ্রেণীর অন্যতম।

সাহিত্য গবেষকদেরও আবার কতকগুলি দিক থেকে বিভিন্ন ভাবে শ্রেণীভুক্ত করা যায়।—

ক. ভাষাভিত্তিক শ্রেণীভেদ :

ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য-গবেষক।

খ. সাহিত্য শাখাভিত্তিক শ্রেণীভেদ :

নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস ইত্যাদি শাখার সাহিত্য-গবেষক।

গ. সাহিত্যিক-কেন্দ্রিক শ্রেণীভেদ :

রবীন্দ্র-গবেষক, শরৎ-গবেষক, বঙ্কিম-গবেষক ইত্যাদি সাহিত্য-গবেষক।

ঘ. সাহিত্যের উপকরণ ভিত্তিক শ্রেণীভেদ :

পুঁথি-গবেষক, মৌখিক সাহিত্যের গবেষক ইত্যাদি সাহিত্য-গবেষক।

ঙ. সাহিত্যের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীভেদ :

সাহিত্যতত্ত্বের গবেষক, তুলনামূলক সাহিত্যের গবেষক ইত্যাদি। তাছাড়া বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে আরো কিছু শ্রেণীভেদ সম্ভব হতে পারে।

গবেষক-চরিত্র : প্রথমেই একটা প্রশ্ন এসে যায়,—গবেষণার কাজ করবার জন্য বিশেষ চারিত্রিক বা মানসিক গুণ-অর্জনের প্রয়োজন আছে কিনা। কাজের মধ্য দিয়েই গবেষক যখন বিচার্য, তখন চারিত্রিক বা মানসিক গুণ অর্জনের প্রসঙ্গ অহেতুক ও অবাস্তব আদর্শবাদ-প্রসূত বলে অনেকে মনে করতে পারেন। কিন্তু গবেষণা-পদ্ধতির কথা ভাবতে গেলে যাঁর মাধ্যমে কাজ, তাঁকেও পদ্ধতির অন্তর্গত না করে নিলে ত্রুটি থেকে যায়। তাই এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিকতা আছে বলে গ্রন্থকার মনে করেন।

বস্তুতঃ, এই যোগ্যতা অবলম্বন করে তাই তথাকথিত 'অল্পশিক্ষিত' বা 'অর্ধ-শিক্ষিত' ব্যক্তিও এমন-কিছু গবেষণার পথে যেতে পারেন—যা তথাকথিত শিক্ষিত গবেষকদের লজ্জা দিতে পারে। আবার যথার্থ গবেষক-মানসিকতার অভাবে অনেক 'কৃতী' 'শিক্ষিত' ব্যক্তি নিম্নমানের গবেষণা অথবা 'দূষিত' (দুর্নীতি-ভিত্তিক) গবেষণা করে থাকেন। তবে স্বভাবজ বৈশিষ্ট্য বা প্রতিভা না থাকলেও অর্জনে সবই সম্ভব।

প্রথমেই শারীরিক সামর্থ্যের কথা চিন্তা করতে হয়। গবেষণার ক্ষেত্রে শারীরিক কষ্ট-সহিষ্ণুতা অর্জনের জন্যই শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া শরীরের সঙ্গে মনের নিকট-সম্পর্কের কথাও ভাবা উচিত। প্রায়ই গবেষণার কাজে ঘোরাঘুরি করতে হয়, কখনো বা একটানা কাজ করতে হয়। অসুস্থ শরীরে তা করা সম্ভব হয় না। অনেক সময় শরীরের অসামর্থ্য গবেষণায় নিষ্ঠা কমিয়ে দিতে পারে। এতে মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হওয়ায় চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রেও বেশি গভীরে যাওয়া সম্ভব হয় না। মানসিক বিক্ষিপ্ততা বা অভিনিবেশের অভাব গবেষণার ক্ষতিই করে থাকে। মোটকথা শারীরিক অসুস্থতায় ও মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যে গবেষণার মান নেমে যেতে বাধ্য।

তাছাড়া গবেষকের উচিত, সহজ জীবনযাত্রায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া। অস্বাভাবিক রূপচর্চার বা পোষাক-আশাকের বন্ধন, খাদ্য-বিলাস, নেশার বন্ধন—ইত্যাদি গবেষণার পক্ষে বাধাস্বরূপ। এ সব বন্ধন থাকলে সময়ের অপচয় যেমন ঘটে, তেমনি যে কোনো প্রয়োজনের মুহূর্তে এই জাতীয় বন্ধন তার নিজস্ব সময়ের মাশুল আদায় করে। কোনো স্থানে গিয়ে গবেষক এ সব ব্যাপারে নিজে বিব্রত হতে পারেন, অথবা অন্যকে বিব্রত করতে পারেন।

মনে রাখা উচিত যে, গবেষণা নিতান্তই পরীক্ষা-উত্তরণ নয়। অপরের প্রদত্ত সাজেস্টিভ তৈরী-উত্তর পরীক্ষার খাতায় তুলে ধরে কৃতী ছাত্র হিসেবে পরিচিত হওয়া যায়—যদি জ্ঞান ভাণ্ডারে দীনতাও থাকে। তাছাড়া দুর্নীতির ব্যাপারও এ প্রসঙ্গে অনেকে হয়তো টানতে পারেন। সুতরাং বিশেষ করে অ্যাকাডেমিক গবেষণাতে যথাযথ যোগ্যতা-পরিমাপসূচক ডিগ্রীলাভের পর জ্ঞানের ভিত পাকা করে নিতে হবে। এর জন্য সাহিত্য ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে মৌলিক চিন্তার ভিত্তিভূমি হিসেবে আরও কিছু জ্ঞান অর্জন করে নিতে হয়। তাছাড়া আমাদের অ্যাকাডেমিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে বহু অপূর্ণতা থাকে। যেগুলি নিতান্তই পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত, নির্ধারিত স্বল্প সময়ের মধ্যে সেই বিষয়েরই শুধু পল্লবগ্রাহী জ্ঞান অর্জনের জন্য অন্যের লেখা আলোচনাগ্রন্থের জ্ঞানই সর্বস্ব হয়ে ওঠে। এর ফলে প্রতিটি ছাত্রের মধ্যে মৌলিক চিন্তা জেগে ওঠার কোনো সুযোগ থাকে না। জ্ঞানের ব্যাপকতা, জ্ঞানের গভীরতা—ইত্যাদি ব্যাপারে কোনো আগ্রহও থাকে না। বিশেষ করে অ্যাকাডেমিক বিদ্যা অর্জনে জ্ঞান যেখানে গৌণ হয়ে পড়ে, সেখানে বিশেষভাবে ব্যক্তিগত তাগিদে অনেক অপূর্ণতাকে ভরিয়ে তোলার দরকার হয়। সম্পূর্ণ ভিন্নতর অ্যাকাডেমিক পরিবেশ হলেও গবেষক ধীরে ধীরে নিজেকে তৈরী করে নেবেন। অনভ্যাসে এই আগ্রহ থাকে না। তবে জ্ঞানার্জনের অভ্যাসে জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। এই আকর্ষণ থেকে আসে মৌলিক চিন্তাভাবনার ক্ষমতা। এই প্রবণতাই গবেষক-মানসিকতার মূল।

গবেষণার জন্য গবেষকের কিছু ব্যাবহারিক জ্ঞান অর্জনেরও দরকার হয়। সে ব্যাপারেও গবেষকের সমান আগ্রহ থাকা উচিত। লাইব্রেরী ওয়ার্ক, বিবিধ তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা, বিভিন্ন ধরনের তালিকা প্রণয়নের অভিজ্ঞতা অর্জন, ফাইল মেনটেন, ডায়ারি লেখা, পুরোনো ও চলমান পত্রপত্রিকা সম্পর্কে আগ্রহ, আধুনিক খবরাখবর, চলমান সমগোত্রীয় গবেষণা-গুলির খবরাখবর, বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর,—গবেষকের কাছে এ সব আশা করা উচিত।

সততা গবেষকের কাছে বাঞ্ছনীয়। অন্যের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ যদি গবেষক স্বীকার না করেন, যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে কাল্পনিক তথ্য কাল্পনিক উৎস উল্লেখের মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য বলে প্রচার করেন, তবে তা দুর্নীতির পর্যায়ে পড়ে। যদি কেউ যেন তেন প্রকারেণ ডিগ্রী আদায়ের জন্য তত্ত্বাবধায়ককে বিভিন্ন ঘৃণ্য উপায়ে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেন, বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে গবেষণার পরীক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের সন্তুষ্ট বা প্রলোভিত করতে চেষ্টা করেন, দরিদ্র মেধাবী কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে অর্থের বিনিময়ে থিসিস লিখিয়ে নেন, তবে তিনি দুর্নীতিপরায়ণ গবেষক। এই পথ গবেষকরা আদৌ গ্রহণ করবেন না।

গবেষকের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় থাকা উচিত। অনেক জিনিসই প্রথমে অসাধ্য বলে মনে হয়। কিন্তু বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে অনেক কঠিন জিনিসও সহজ হয়ে যায়। এমনকি অপরে যদি গবেষক সম্পর্কে তাঁর নৈরাশ্য প্রত্যক্ষভাবে গবেষককে জানানও, তবু গবেষকের পক্ষে আত্মবিশ্বাস হারানো অনুচিত। প্রতিটি মানুষের অন্তরে জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার থাকে। বাইরের উপাদান তাকে উস্‌কে দেয় মাত্র। তাই বাইরের উপাদান-সর্বস্বতা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেলে উপাদানের অভাবে গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। আত্মগত বিষয়মাত্রেই পরিত্যাজ্য—তা নয়। বস্তুর সন্নিহিত থেকে আত্মগত প্রক্রিয়াগুলি অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে, তা কখনো উন্মার্গ কল্পনায় পর্যবসিত হতে পারে না।

মনে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা না থাকলে এ পথে আসা অনুচিত। কোনো মূল্যেই গবেষণার কাজ ত্যাগ করবো না,—এই মনোবল নিয়ে গবেষকদের কাজে নামা উচিত। অনেক সময় আর্থিক অস্বচ্ছলতা, পরিবেশের বিরোধিতা, অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে অসহযোগিতা ইত্যাদি গবেষণার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। সেক্ষেত্রে লক্ষ্য স্থির রেখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া উচিত। তবে এমন অবস্থাও অবাস্তব নয় যে, গবেষণা চালানো সম্পূর্ণ অসম্ভব। তখন সেসব ক্ষেত্রে মনে অনেকে স্বার্থপরতাকে পুষে রেখে অথবা ভাবপ্রবণতার বশে নিজের হাতে তাঁদের অর্ধসমাপ্ত গবেষণা ধ্বংস করে ফেলেন। কিন্তু তা না করে সৎ গবেষক নিজের গবেষণার পদক্ষেপ উপযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দিয়ে কাগজপত্র তাঁকে উপহার দিয়ে থাকেন। এই উপহারের ক্ষেত্রে কোনো প্রত্যাশা না রাখা উচিত।

অহংবোধ গবেষণার ক্ষতি করে থাকে। অনেক সময় এই অহংমানসিকতা পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে অথবা তথ্য আহরণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই'—এই পুরোনো প্রবচনকে মূল্য দিয়ে অনেক নিম্নমানের ব্যক্তির সঙ্গেও আলোচনায় এসে লাভবান্ হওয়া যায়। ব্যক্তিটি প্রত্যক্ষভাবে উপাদান সরবরাহ করতে পারে—যা অহংবোধজনিত ব্যক্তিগত অনীহায় সম্ভব হয় না। এমনও দেখা যায় যে, অতি নিম্নমানের কোনো ব্যক্তির যে কোনো ধরনের উক্তির নিজস্ব মূল্য না থাকলেও, সেই উক্তির সূত্র ধরে গবেষকের মনে অন্য কোনো মূল্যবান্ চিন্তাও জাগ্রত হতে পারে। লোকসাহিত্যের জগতে যে সব গবেষক বিচরণ করবেন, তাঁদের যথেষ্ট সহানুভূতিবোধসম্পন্ন হওয়া উচিত।

আবার অনেক গবেষকের মধ্যে অতিরিক্ত সঙ্কোচবোধ লক্ষ্য করা যায়। বহু অপরিচিত ব্যক্তি, অপরিচিত সংস্থার সঙ্গে গবেষককে যোগাযোগ রাখতে হবে প্রত্যক্ষভাবে গিয়ে। সে ক্ষেত্রে এই সঙ্কোচবোধ গবেষণায় ক্ষতি করে থাকে। দূর থেকে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা সম্পর্কে একটা সঙ্কোচবোধ জন্মালে যোগাযোগে অনিচ্ছা

আসে। এর ফলে গবেষক অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। দূর থেকে অনেক কিছুই ভীতিপ্রদও মনে হতে পারে। কিন্তু যোগাযোগের পর পূর্বের সেই মানসিকতার কথা স্মরণ করলে তা নিতান্তই ছেলেমানুষী বলে মনে হবে। সুতরাং এ জাতীয় সঙ্কোচবোধ গবেষকের মধ্যে আদৌ থাকা উচিত নয়।

গবেষকের মন সর্বদাই সক্রিয় থাকবে। অবসর সময়েও গবেষণার বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা অব্যাহত থাকবে, আবার তারই সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের স্পৃহাও যেন নষ্ট না হয়। দেখা যাবে, মূল চিন্তাভাবনা মনকে অধিকার করে থাকলে বিভিন্ন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মধ্যেই কিছু কিছু উপাদান আপনা থেকেই মনকে গবেষণার কাজে সহায়তা করবে। যখনই তা মনে হবে, তখনই—তা যতোই বিক্ষিপ্ত হোক, একটা নোট খাতায় নোট করে নিতে হবে। এগুলি কোনো-না-কোনো সময়ে কাজে লেগে যাবেই।

অধীন ও স্বাধীন গবেষক প্রসঙ্গ : যে গবেষকরা তত্ত্বাবধায়কের অধীনে গবেষণা করেন, তাদের সর্বদা স্মরণে রাখা উচিত যে, তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে গবেষকের সম্পর্ক থাকবে সহযোগিতামূলক। তত্ত্বাবধায়কের আচরণ যদি কোনোক্ষেত্রে গবেষককে ক্ষুব্ধ করে, তাহলেও অনুত্তেজিত থেকে নিজের কাজ করে যেতে হবে। মতভেদ ঘটলে নিজস্ব মত সম্পর্কে তত্ত্বাবধায়ককে ধীরভাবে বোঝাতে হবে। আবার অনেক সময় এও দেখা যায় যে, তত্ত্বাবধায়ক গবেষকের ভ্রম সংশোধন করে দিয়েছেন। তাই গবেষকের দুর্বলতার ইঙ্গিত তত্ত্বাবধায়ক যখনই দেন, তখন তাঁর যুক্তি গ্রহণ করার ব্যাপারটা সর্বক্ষেত্রেই তাঁর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে ধরে নেওয়া খুব খারাপ হবে। তবে একেবারে তত্ত্বাবধায়ক-নির্ভর গবেষণা গবেষকের নিজস্ব কর্মশক্তিকে নিস্তেজ করে দেয়।

নিজের গবেষণার অগ্রগতি, গবেষণাগত সমস্যা—সব কিছু ব্যাপারেই তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা উচিত। যদি কোনো ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়কের মনে আঘাতের সম্ভাবনা থাকে তবে,

সে বিষয়ে আগের থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তত্ত্বাবধায়ক যাতে কোনো কিছু ভুল না বোঝেন, তা তাঁকে বিনীত ভাবে বলা দরকার। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের মাধুর্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ককে যেমন প্রেরণা এনে দেবে, তেমনি গবেষকের নিজস্ব পদক্ষেপ—তাঁর তেমন মনের অনুকূল না হলেও, স্নেহের সঙ্গেই মেনে নিতে তাঁর বাধবে না।

স্বাধীন গবেষকদের সুবিধা-অসুবিধা দুইই আছে। যাঁরা অধীন গবেষক হিসেবে একটি গবেষণার কাজ করার পর দ্বিতীয় গবেষণার কাজ স্বাধীনভাবে করেন, পদ্ধতিজ্ঞান বা গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকার ফলে তাঁদের কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু যাঁরা তাঁদের প্রথম গবেষণার কাজ স্বাধীনভাবে করে থাকেন, তাঁদের অনেক অসুবিধা হয়। কখনো কখনো আত্মমর্যাদাবোধ ও অন্যান্য মানসিক জটিলতা কাজে অসুবিধা ঘটায়। পদ্ধতিজ্ঞানের অভাব অবশ্য অন্য গবেষণা গ্রন্থের দৃষ্টান্ত অনুসরণে পূরণ করে নিতে পারেন। তবে একজন তত্ত্বাবধায়ক থাকলে যে সহযোগিতা পাওয়া যায়, স্বাধীন গবেষক তা না পাওয়ায় নিজের চেষ্টায় খোঁজাখুঁজিতে বেশ কিছু সময় নষ্টও হয়। অনেকে নিজের গবেষণার মান সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন না। তবে তাঁরা স্বাধীনতা ভোগ করেন তাঁদের গবেষণার কাজে। তাদের কাজে ঝুঁকিও থাকে—যদি তা কোনো অ্যাওয়ার্ডের উদ্দেশ্যে করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না নিয়েও অনেকে স্বাধীনভাবে গবেষণা করে থাকেন। অন্যান্য গবেষণার মতো সাহিত্য-গবেষণাতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ অপরিহার্য নয়—যদি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্য প্রধান না হয়। মৌলিক চিন্তাভাবনা করার মূলে জ্ঞানের যে ভিত্তি দরকার, সেটা তৈরী হয়ে গেলে যে কোনো ব্যক্তিই—বিশেষ করে সাহিত্য-গবেষণার পথে অগ্রসর হতে পারেন। যেহেতু এ ধরনের গবেষণা ভেতরের প্রেরণায় আসে, এবং এ ধরনের গবেষণায় নিষ্ঠা থাকে, তাই এই জাতীয় গবেষণার মূল্য নিতান্ত কম নয়। এঁরা

তেমনভাবে সম্মানিত না হলেও শিক্ষিত গবেষকরা পরোক্ষভাবে তাঁদের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন। এঁদের মধ্যে অনেকেই শ্রমে নিষ্ঠা সত্ত্বেও পদ্ধতির দিক থেকে কথনো কথনো ত্রুটি-বিচ্যুতিও করে ফেলেন। তবুও এঁদের সংগৃহীত তথ্য সে সব ক্ষেত্রেও অস্বীকার করা চলে না।

এই জাতীয় গবেষকদের কয়েকটি বিষয়ে অবহিত থাকা উচিত। প্রথমে তাঁদের সহানুভূতিবোধসম্পন্ন গবেষণা-পদ্ধতিবিদ্ কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে পদ্ধতি সম্পর্কিত উপযুক্ত শিক্ষা নিতে হবে। নইলে তাদের সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য উপাদানগুলি শুধু পদ্ধতিবিজ্ঞানের অভাবে অনেক সময়ে একটি 'থিসিস' রচনায় ব্যর্থ হয়। আবার ঐ উপাদানই অন্য চতুর গবেষককে বিনা পরিশ্রমে তাঁর কাম্যবস্তু লাভে সহায়তা করে। ছাপহীন গবেষকরা অনেক সময়েই শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতারিত হন। যথাস্থানে গবেষণা জমা দেবার সুযোগ না থাকায় এঁরা পরিচিত-অপরিচিত-অর্ধপরিচিত কোনো উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারস্থ হন—গ্রন্থাকারে বা ধারাবাহিকভাবে পত্রিকায় প্রকাশের আশায়। যথারীতি তা ঐ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির পকেটস্থ হয় এবং তিনিই খ্যাতি পেয়ে যান। সুতরাং এই ধরনের গবেষকদের ঐ সব ব্যাপারে খুব সতর্ক হতে হবে।

গবেষণা একটি পবিত্র কাজ, সমগ্র মানবজাতির প্রতি তাঁর একটি মহান্ কর্তব্য সম্পাদন। গবেষকের জন্য গবেষণা নয়, গবেষণার জন্যই গবেষক,—এ কথা গবেষকদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে। অন্তরের সেই মহান্ বোধটিই গবেষকের মূল প্রেরণা হয়ে অনেক বাধা বিঘ্নের ঝঞ্ঝায় তাঁর তরণীকে স্থির ভাবে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যেতে সমর্থ হবে।

---

৩. সাহিত্য-গবেষণার উৎস ও উপকরণ

সাহিত্যগবেষণার জন্য বাইরের কিছু উৎস ও উপকরণ রয়েছে। গবেষক সাধারণতঃ এই উৎস ও উপকরণগুলির মাধ্যমে সাহিত্য-গবেষণার কাজগুলি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। সাহিত্য শুধু তথ্য নিয়ে কাজ করে না। তাই গবেষকের মন অনেক সময় প্রধান উৎস ও উপকরণ হয়ে উঠতে পারে। তবে বর্তমান প্রসঙ্গ শুধু বাইরের উৎস ও উপকরণগুলির আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হলো।

১. **মৌখিক তথ্য** : মৌখিক তথ্য দুধরনের হতে পারে।—

ক. **মৌখিক সাহিত্য**

খ. **সাহিত্য সম্পৃক্ত অন্যান্য তথ্য**

মনের ভাবকে সাহিত্যে ভাষার মাধ্যমে রূপ দিতে হয়। ভাষা অক্ষর জ্ঞান ব্যতিরেকেও আয়ত্ত করা যায়। তাই নিরক্ষর মানুষও সাহিত্য রচনা করতে পারেন। আবার কোনো কোনো সাক্ষর ব্যক্তি তাঁর সৃষ্ট কোনো রচনা প্রথমে লিপিবদ্ধ করলেও পরে তা মৌখিক-ভাবে লোক পরম্পরায় প্রচলিত হয়ে আসছে। কোনো কোনো সাক্ষর ব্যক্তি লিপিবদ্ধ না করেও মৌখিক ভাবে প্রচার করেছেন, এ সম্ভাবনাও অস্বীকার করা যায় না। এ সব কিছুই মৌখিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। মৌখিক সাহিত্য সংগ্রাহকের মাধ্যমে তা আধুনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হয় গ্রন্থে অথবা Audio visual Document আকারে। মৌখিক সাহিত্যের কালনিরূপণ, বিশুদ্ধি নিরূপণ কিংবা রচয়িতা নির্ধারণ সম্পর্কে অনেক কিছু সমস্যা থাকে। সাক্ষাৎকার পদ্ধতি, প্রশ্নাবলী পদ্ধতি ইত্যাদির মাধ্যমে সাহিত্য সম্পৃক্ত অন্যান্য তথ্য আহৃত হয়ে থাকে।

বিভিন্ন দিক থেকে সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে মৌখিক সাহিত্যের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়। মৌখিক তথ্যেরও গুরুত্ব বেশি বৈজ্ঞানিক না হলেও অনেক সময় অনেক জটিল সমস্যার সমাধানেও সার্থক হয়েছে।

২. **পাণ্ডুলিপি ও পুঁথি** : কিছু কিছু সাহিত্য পুঁথির পর্যায়ে পড়ে না, আবার মুদ্রিত পুস্তক পর্যায়েও পড়ে না। এগুলি সাহিত্য গবেষণায় অবহেলিত নয়। বেশকিছু মৌখিক সাহিত্য মুদ্রাযন্ত্রের যুগেই কোনো কোনো সংগ্রাহক কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়ে পাণ্ডুলিপি আকারে কোথাও কোথাও সংরক্ষিত হয়ে আছে। পরবর্তীকালের বহু সংগ্রাহক এই জাতীয় 'খাতার' সহায়তা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এই জাতীয় পাণ্ডুলিপি সাহিত্যগবেষণার অন্যতম উৎস।

সাহিত্য গবেষণার একটি প্রধান উৎস ও উপকরণ পুঁথি। যদিও পুস্তক ও পুঁথি ব্যুৎপত্তির দিক থেকে একার্থবাচক, তবুও আমরা পুঁথি বলতে বুঝি তালপাতা বা তুলট কাগজে ভূষোকালিতে হাতে লেখা গ্রন্থ। এগুলি প্রাঙ্‌মুদ্রণ যুগের বই। গ্রন্থের পবিত্রতা রক্ষার জন্য মুদ্রণ যুগেও পুঁথি লেখা হয়েছে প্রাচীন পদ্ধতিতে। ব্যাপকভাবে বাংলা হরফে মুদ্রিত বই প্রকাশ হতে থাকলে এবং তা সুলভ হলে পুঁথির প্রচলন ক্রমে ক্রমে উঠে যায়।

অন্ততঃ এ অঞ্চলে পুঁথিগুলো লম্বা ধরনের ছিলো এবং লেখাও হতো লম্বালম্বি। মাঝখানে গ্রন্থির জন্য লেখায় ফাঁক রাখা হতো। ঐ ফাঁকে ফুটো করে সুতোর মাধ্যমে পাতাগুলোর ধারাবাহিকতা স্থায়ী করে রাখা হতো। সুতোটা প্রয়োজন মতো খোলা যেতো এবং অন্যকে পাতা ধার দেওয়াও যেতো। ধার দেওয়া পাতাগুলির জায়গায় বিচ্ছিন্ন কাগজে সে ব্যাপারে নোট রাখা হতো। আগে ও পরে পৃষ্ঠার চেয়ে সামান্য একটু বড়ো লম্বা কাঠের দুটো কভার থাকতো। অনেক শৌখিন পুঁথি সংরক্ষক পটুয়াকে দিয়ে কভার চিত্রিত করে নিতেন। এগুলি লাল কাপড়ে জড়ানো থাকতো। ধর্মীয় পুঁথিগুলি যখন-তখন অপবিত্র ভাবে স্পর্শ করা যেতো না। কিছু কিছু পুঁথি ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকলেও মন্দিরেও গ্রামীণ সম্পত্তি হিসেবে কিছু কিছু পুঁথি সংরক্ষিত হতো। বড়ো বড়ো রাজা-জমিদারদের নিজস্ব সংগ্রহশালা ছিলো।

কোষ্ঠী ধরনের পাকানো কাগজের পুঁথিও প্রচলিত ছিলো।

কাগজের শুরুতে ও শেষে কাঠি থাকতো। এই জাতীয় পুঁথি খুব কমই পাওয়া যায়।

পুঁথি যেহেতু হাতের লেখা এবং অধিকাংশই প্রাঙ্‌মুদ্রণ যুগের, তাই এগুলোর হরফ বুঝে পাঠ করা সম্পর্কেও পাঠ নিতে হয়—বিশেষ করে বেশি প্রাচীন পুঁথি হলে। হরফের আদল যুগে যুগে পাল্টায়, তবে অনেকে পরবর্তীকালে পুঁথি লিখলেও রক্ষণশীল হরফ প্রয়োগ করতেন। পুঁথির পেশাদার লিপিকরও ছিলেন। তাছাড়া গায়েন বা গ্রন্থকার নিজেও পুঁথি লিখতেন। অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে তালপাতার পুঁথি বেশি চলতো। স্বাধীন ক্ষেত্রেও তালপাতার ব্যবহার ছিলো বেশি।

সাহিত্য গবেষণায় পুঁথির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। পুরোনো যুগের সাহিত্য উদ্ধার করে আমাদের সাহিত্য-সম্ভারকে আধুনিক আলোকে ও রসিক মহলে তুলে ধরবার জন্য বিভিন্ন পুঁথি সংগ্রহ চলছে এবং বিভিন্ন স্থানে পুঁথির সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গবেষকদের জন্য ব্যক্তিগত ও সংস্থাগত সংগ্রহশালাগুলির পুঁথির তালিকা একত্র পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টিরও প্রচেষ্টা চলছে।

একাধিক পুঁথির পাঠ পাশাপাশি রেখে মূল পাঠ নির্ধারণের চেষ্টা দেখা যায়। মূল পাঠ নির্ধারণের দ্বারা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের মূল্যায়নে যথেষ্ট সুবিধা হয়। পুঁথির প্রাচীনত্ব, কাল বা গুরুত্ব বিচার করে মূল গ্রন্থ সম্পর্কে আলোকপাত করা সম্ভবপর হয়। হরফ বিচার, ভাষা বিচার, বিজ্ঞানের ল্যাবরেটারিতে তুলটকাগজ, তালপাতা বা কালির প্রাচীনত্ব বিচার, পুষ্পিকা অর্থাৎ গ্রন্থসংক্রান্ত তথ্য বিচার ইত্যাদির মাধ্যমে সাহিত্য গবেষণার জগৎ অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে।

তাছাড়া ভিন্ন জাতীয় হলে একটি পুঁথির মাধ্যমে অন্য পুঁথির সম্পর্কে আলোকপাতও সম্ভব হয়ে থাকে। একজন গ্রন্থকার অন্য গ্রন্থকার সম্পর্কে উল্লেখ করেন। কখনো বা একই গ্রন্থকারের অন্য গ্রন্থে পূর্বগ্রন্থ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ থাকে। সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে তা সহায়ক হয়।

পুঁথি সংশ্লিষ্ট নতুন তথ্য বা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা, মূল গ্রন্থের মূল্যায়ন, লেখকের প্রতিভা বিচার ইত্যাদির উৎস হিসেবে এই পুঁথিগুলির দান অপরিসীম। পরবর্তীকালে বহু পুঁথি মুদ্রিত হলেও পাণ্ডুলিপি আকারের পুঁথি গুলির প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় নি।

৩. **পত্র-পত্রিকা**: গবেষণার ক্ষেত্রে সাময়িক পত্রিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ ও উৎস। সাময়িকপত্রে সময়ের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। তাই সময়কেন্দ্রিক সাহিত্যে সাময়িকপত্রের গুরুত্ব বেশি। তাছাড়া সাময়িকপত্রে বিবিধ আলোচনা অনেক বিষয়েই আলোকপাত করে থাকে। সময়ের ব্যবধানে মুদ্রিত আকারে সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়ে থাকে। তথ্য এবং তথ্যভিত্তিক বক্তব্য উভয়ই সাময়িকপত্রের বিষয়বস্তু। সাময়িকপত্র এদেশে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলা সাময়িকপত্র প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই সময়কেন্দ্রিক তথ্য হিসেবে সাময়িকপত্রকে গ্রহণ করা যেতে পারে। উনিশ ও বিশ শতকের সাহিত্য ও সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র, বিভিন্ন ধরনের মানসিকতা, অর্থনৈতিক কাঠামো, শিক্ষা-সংস্কৃতি—সবকিছু সম্পর্কেই সাময়িকপত্র অনেক কিছুরই ইঙ্গিত দিতে পারে।

নতুন ও পুরোনো—দু'ধরনের সাময়িকপত্রই কাজে আসে। পুরোনো সাময়িকপত্র যেমন তথ্য সংরক্ষণ করে থাকে, তেমনি নতুন সাময়িকপত্রে থাকে নতুন চিন্তাভাবনা—যা সংরক্ষিত তথ্যকে বিচারে সহায়তা করে। তুলনামূলক চিন্তাধারা নতুন সাময়িকপত্রের মাধ্যমে মনে জাগ্রত হয়।

সাহিত্য গবেষণার দিক থেকে সাময়িকপত্রের গুরুত্বকে নিম্নোক্ত দিক থেকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।—

ক. বিভিন্ন গবেষক সাময়িক পত্রের মাধ্যমে তাঁদের নতুন তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কারের দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

খ. সাময়িকপত্রে প্রকাশের জন্য প্রেরিত রচনাগুলি বিচারের

জন্য বিশেষজ্ঞ পরিষদ থাকে। বিশেষজ্ঞ দিয়ে বিচারের ব্যবস্থা থাকায় গবেষণামূলক তথ্য ও তত্ত্বের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকে।

গ. সাময়িকপত্রের নতুন নতুন সংখ্যায় নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। কিন্তু পুরোনো সংখ্যায় প্রকাশিত তথ্য ও তত্ত্বের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না। এগুলি তথ্য ও তত্ত্বের সংরক্ষণ হিসেবে কাজ করে থাকে।

ঘ. সাময়িক পত্রগুলিতে যে তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশিত হয় তা সমকালীন পাঠকদের বিচার, স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির জন্য খোলা থাকে। তাই উক্ত তথ্য ও তত্ত্বকে কেন্দ্র করে সর্বজনগ্রাহ্য মত গড়ে ওঠে। এর ফলে জ্ঞানের সঠিক রূপটি প্রত্যক্ষীভূত হয়।

ঙ. সাময়িকপত্রের মধ্যে সমকালীন বিষয় প্রকাশিত হওয়ায় সময়-কেন্দ্রিক গবেষণার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের সাময়িক পত্রগুলি বিভিন্ন দিক থেকে সহায়তা করে থাকে।

চ. লেখকের মৃত্যু বৎসরের সমকালীন পত্র-পত্রিকায় কিংবা জন্ম শতবার্ষিকী ইত্যাদি ধরনের বিশেষ বিশেষ সময়ের পত্র-পত্রিকায় লেখক সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়ে থাকে। এগুলি লেখক ভিত্তিক আলোচনায় সহায়ক হয়।

ছ. লেখকের জীবনের কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠা বা স্বীকৃতিকে কেন্দ্র করে সে সময়ে সাময়িকপত্রে কিছু আলোচনা থাকে।

জ. লেখককে নিয়ে সাময়িক পত্রের বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হয়—যা লেখকভিত্তিক গবেষণায় প্রয়োজনীয়।

ঝ. বিক্ষিপ্তভাবে লেখকের পত্রাবলীর প্রকাশ, গ্রন্থ সমালোচনা ইত্যাদি লেখক বা রচনা সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারে অথবা গবেষণার তথ্য হিসেবে গৃহীত হতে পারে।

ঞ. সাময়িকপত্র অনেক সময় বিখ্যাত লেখকের দ্বারা পরিচালিত হয়। সেখানে তাঁদের লেখা সম্পাদকীয়গুলি অথবা অন্য রচনা গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা হিসেবে গবেষণার সহায়তা করতে পারে।

সাময়িকপত্রের গবেষণা দু'ধরনের হতে পারে।—ক. সাময়িকপত্র ভিত্তিক গবেষণা, খ. অন্য কোনো কিছু ভিত্তিক গবেষণা—যেখানে সাময়িকপত্র সহায়তাকারী।

গ্রন্থের মধ্যে অথবা ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মধ্যে এমনও দেখা গেছে যে সেখানে তথ্য বিভ্রান্তিকর—যা সাময়িকপত্রে সংরক্ষিত তথ্যের দ্বারা সংশোধিত হয়েছে।

৪. **সমগোত্রীয় বিভিন্ন তথ্য-উৎস ও উপকরণ**

ক. **বিজ্ঞাপিত গ্রন্থতালিকা**: বিভিন্ন বড়ো বড়ো প্রকাশক প্রতি মাসে, কয়েক মাস অন্তর অথবা প্রতি বছরে ইতিমধ্যে প্রকাশিত বইয়ের বর্ণনাত্মক তালিকা প্রকাশ করে থাকেন (সংস্করণ সহ)। তাছাড়া তার সঙ্গে তাঁদের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বইয়ের সাধারণ তালিকাও থাকে। এগুলির মধ্যে চলমান চিন্তাজগতের সন্ধান যেমন পাওয়া যায়, তেমনি এগুলির মাধ্যমে পুরোনো বিষয়ের ওপরে আলোক পাওয়া সম্ভব।

খ. **গবেষণা-রিপোর্ট**: সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে এর তেমন প্রচলন না থাকলেও অন্যান্য গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণা-রিপোর্টগুলির মূল্য আছে।

গ. **কনফারেন্স প্রসিডিংস্**: এক একটি কন্‌ফারেন্সকে কেন্দ্র করে তার যে প্রসিডিংস্ প্রকাশিত হয়ে থাকে, তা তথ্যসমৃদ্ধ। তাই গবেষণার ক্ষেত্রে এগুলির গুরুত্ব আছে।

ঘ. **চলমান গবেষণার তালিকা**: সাহিত্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থার ক্ষেত্রে গবেষণার নতুন নতুন রেজিস্ট্রেশনকে ভিত্তি করে একটা সমবায়িকভাবে গবেষণার শিরোনামের তালিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে অন্যত্র। এগুলির মাধ্যমেও গবেষণা সম্পর্কে চিন্তাভাবনার বণ্টনসাম্য ঘটে। নইলে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একই শিরোনামে গবেষণা চললে তা চিন্তার অপব্যয় বলা যেতে পারে।

ঙ. **গবেষণার নির্যাস-পঞ্জী**: সাহিত্যকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে যা কিছু গবেষণা (প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত) সম্পাদিত হয়েছে, সেগুলির নির্যাস এই পঞ্জীতে থাকে। তাছাড়া সাময়িকপত্রের মতো প্রতি বছরে সর্বভারতীয় ও বহির্ভারতীয় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য সম্পর্কিত উত্তীর্ণ গবেষণাগুলির নির্যাসপঞ্জী সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এগুলি গবেষণাকার্যে সহায়তা করে থাকে।

চ. **সাহিত্য-বর্ষপঞ্জী**: প্রতি বছরে প্রকাশিত এ ধরনের গ্রন্থে সেই বছরের সাহিত্য সংক্রান্ত যাবতীয় উপাদান একত্র গ্রথিত থাকে। তাই এগুলি গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ছ. **অপ্রকাশিত গবেষণা**: প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে Typed Copy-আকারে প্রচুর অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ রক্ষিত আছে। এগুলির কিছু কিছু নিম্নমানের হওয়ায় উদ্দেশ্যমূলকভাবেই অপ্রকাশিত রাখা হয়। আবার কিছু কিছু গবেষণা অবাণিজ্যিক হওয়ায় মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করেনি। অন্যত্র বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্মতি সাপেক্ষে এগুলি পড়বার ব্যবস্থা আছে। এগুলি গবেষণার ক্ষেত্রে অনেকখানি সহায়ক হতে পারে।

জ. **লাইব্রেরী ক্যাটালগস্**: প্রত্যেক পাঠাগারেই মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থতালিকা আছে। এই গ্রন্থতালিকাগুলি বহুক্ষেত্রেই গবেষকের মনের চিন্তাভাবনা জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করে থাকে।

ঝ. **গবেষক উদ্ধৃত গ্রন্থপঞ্জী**: এগুলির মধ্য দিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের সন্ধান জানা যায়। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এগুলির গুরুত্ব—সে বিষয়েও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ঞ. **গ্রন্থ ও পত্রিকায় প্রদত্ত গ্রন্থ-বিজ্ঞাপন**: এইসব বিজ্ঞাপন আগ্রহসহ পাঠ করা উচিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত কিছু বই অপ্রকাশিত থেকে যায়। তবে সন্ধান জেনে পাঠাগারের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ট. **গ্রন্থ-প্রদর্শনী** : বিভিন্ন অবিক্রেয় গ্রন্থ-প্রদর্শনী ও বিপণিতে সজ্জিত গ্রন্থরাজি (পুরোনো ও নতুন) গবেষককে সহায়তা করতে পারে।

৫. **মুদ্রিত গ্রন্থ** : সাধারণতঃ দেখা যায় সাহিত্য-গবেষকরা প্রধানভাবে মুদ্রিত-গ্রন্থ-নির্ভর হয়ে থাকেন। পাঠাগারেই মুদ্রিত গ্রন্থ পাঠের সুযোগ থাকে। তাছাড়া ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকেও তা পাঠ করা যেতে পারে সম্মতি-সাপেক্ষে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ গবেষক ক্রয় করতেও বাধ্য হন। মুদ্রিত গ্রন্থ সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।—

ক. **রেফারেন্স বুকস্**
খ. **সাবজেক্ট বুক্স্**
গ. **ক্রিয়েটিভ্ বুক্স্**

ক. **রেফারেন্স বুক্স্** : রেফারেন্স বুক বলতে আলোচনাগ্রন্থ আমরা বুঝে থাকলেও যাকে চলতি কথায় রেডি-রেফারেন্স বলি, তাকেই রেফারেন্স বই বা আকর-গ্রন্থ বলা হয়। হ্যাণ্ড বুক্, টেবলস্, বুক অব কোটেশানস্ বা ডিক্সনারি অব থটস্ ধরনের বই, সংকেতাক্ষর কোষ, তারিখ কোষ, নাম-কোষ, জীবনীকোষ, সাহিত্যকোষ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কোষগ্রন্থ, পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক ইত্যাদি বিষয়-ভিত্তিক কোষগ্রন্থ ইত্যাদি বিচিত্র জাতীয় রেফারেন্স বই পাওয়া যায়। কিছু কিছু বই দুষ্প্রাপ্য, আবার কিছু কিছু বই পাওয়া যায়। এগুলি নিজস্ব সংগ্রহে থাকা ভালো।

খ. **সাবজেক্ট বুক্স্** : বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থগুলিকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।—

অ. **ট্রিটিজ**
আ. **মনোগ্রাফ**
ই. **টেক্সট বুকস্**

ট্রিটিজের মধ্যে কোনো বিষয় নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা থাকে। মনোগ্রাফ একটি বিষয়ের বিশেষ একটি দিককে কেন্দ্রীভূত করে

আলোচনা করা হয়। তাই এর পৃষ্ঠভূমি বিস্তৃত হয় না। এ জাতীয় গ্রন্থে নতুন তথ্য বা তত্ত্বের ওপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। টেক্সট বুক্‌স্ বা পাঠ্যগ্রন্থ ছাত্রদের শিক্ষাদানের সহায়তায় বিশেষভাবে রচিত। এগুলি একজন লেখকের রচনা হতে পারে, আবার বিভিন্ন লেখকের রচনা সংকলন হতে পারে। এগুলির মধ্যে নতুন কোনো বক্তব্য থাকে না। পাঠ্যগ্রন্থে পুরোনো বক্তব্যকে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজভাবে পরিবেশন করা হয়। পাঠ্যগ্রন্থকে কেন্দ্র করে এডুকেশন বিষয়ে শুধু নয়, সাহিত্য বিষয়েও গবেষণা চলতে পারে। শুধু সাহিত্য সংক্রান্ত পাঠ্য গ্রন্থ নয়, অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত পাঠ্যগ্রন্থও সাহিত্য গবেষণার কাজে আসতে পারে। খ্যাতনামা লেখকের রচিত পাঠ্যগ্রন্থ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা তাঁর নন্‌-অ্যাকাডেমিক রচনার প্রসঙ্গে পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এসে যেতে পারে।

গ. **ক্রিয়েটিভ বুকস্‌**: উপন্যাস, নাটক, রম্যরচনা কবিতা ইত্যাদি সৃজনী সাহিত্যমূলক গ্রন্থকে ক্রিয়েটিভ বুকস পর্যায়ে ফেলা যায়। তথ্য-বিজ্ঞানে এই জাতীয় গ্রন্থ অপ্রয়োজনীয় হলেও সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে এগুলির প্রয়োজন সকলেই জানেন। অনেক ক্ষেত্রেই সাহিত্য গবেষণার মূল ভিত্তি এই সব ক্রিয়েটিভ বইগুলি। সাহিত্য গবেষণায় লেখকের মানসিক প্রবণতা বিচার, প্রতিভা বিচার, তুলনামূলক প্রতিভা বা সাহিত্য বিচার—সব কিছুর ক্ষেত্রেই ক্রিয়েটিভ বইগুলির গুরুত্ব প্রধান ভাবে বিবেচ্য।

ঙ. **অডিও ভিস্যুয়্যাল তথ্য**: মুভি ক্যামেরা, টেপ-রেকর্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে গৃহীত ক্যাসেট ফিল্ম ইত্যাদি আধুনিক গবেষণায় প্রয়োজনীয়। মৌখিক সাহিত্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের সঙ্গে নৃত্য বা সঙ্গীতের সম্পর্ক নির্ণয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে এগুলির বিশেষ গুরুত্ব আছে। এগুলির বিশেষ বিশেষ সংগ্রহশালা আছে এবং প্রজেক্টার, ভি সি পি, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে সেগুলি চর্চার সুবিধা আছে। এমন কি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে এগুলি কপি করে নেবার ব্যবস্থাও আছে।

তাছাড়া মাইক্রোকার্ড, মাইক্রো ফিল্ম, Microfiche ইত্যাদি যা সংরক্ষিত আকারে থাকে, তা এন্‌লার্জমেন্টের মাধ্যমে দেখাবার ব্যবস্থাও আছে।

তথ্যবিজ্ঞানে Conventional Documents, Neo conventional Documents, Non Conventional Documents এবং Meta Documents এই চার জাতীয় নথির ভাগ আছে। বলা বাহুল্য সাহিত্য গবেষণায় এ জাতীয় ভাগের সার্থকতা নেই।

৭. **প্রত্যক্ষ তথ্য:** সাহিত্য গবেষণায় প্রত্যক্ষ তথ্যের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। জীবিত সাহিত্যিকের রচনাসংক্রান্ত গবেষণায় তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার, প্রয়াত সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে তাঁর জীবিত পরিচিতবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, লোকসাহিত্য গবেষণায় লোকসাহিত্য-সংরক্ষক, লোক-আঞ্চলিক ব্যক্তি ইত্যাদির সঙ্গে সাক্ষাৎকার গবেষণার ক্ষেত্রে সঙ্গীতগায়ক, প্রধান উৎস। এগুলি সংরক্ষণ কাগজে কলমে (স্বাক্ষরিত), ক্যাসেটে ইত্যাদি বিভিন্ন নথিতে করে রাখা যায়। তাছাড়া কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, Gate Keeper of Knowledge ধরনের ব্যক্তি, সেমিনারে উপস্থিত ব্যক্তির সঙ্গে আনুষঙ্গিক আলোচনা—এগুলির মূল্য আছে।

৮. **ডায়ারি:** অনেক সাহিত্যিক, সাহিত্যিক সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তি ইত্যাদির ব্যক্তিগত ডায়ারি অনেক সময় সাহিত্যিক ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারে। দিনক্ষণ ভিত্তিক ডায়ারিগুলি কাল বিচারের ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে।

৯. **পত্রাবলী:** সাহিত্যিক বা সাহিত্যিক সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তির পত্রাবলী সাহিত্য গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ। পত্রাবলী দুই আকারে পাওয়া যায়।—

ক. মুদ্রিত

খ. অমুদ্রিত

মুদ্রিত পত্রগুলি পত্র ও পত্রোত্তর সহ পাওয়া যায়। আবার শুধু এক পক্ষীয় পত্রও সংকলিত হয়ে থাকে। অমুদ্রিত পত্র গুরুত্বপূর্ণ হলে তার ফোটোগ্রাফ বা জেরক্স কপির প্রয়োজন থাকে।

১০. **ছিন্ন পাণ্ডুলিপি** : এগুলি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অথবা পত্র—কোনো পর্যায়েই পড়ে না। অনেক সময় সাহিত্যিক বা সাহিত্যিক সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তির রক্ষিত কাগজপত্রের মধ্যে এ-জাতীয় পাণ্ডুলিপি থাকে। অনেকক্ষেত্রেই আবর্জনার স্তূপে থেকে এগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অনেক রচনার খসড়া এই আকারে থাকে। এগুলির মধ্য দিয়েও অনেক কিছুতে আলোকপাত ঘটতে পারে।

১১. **প্রশ্নাবলী দ্বারা গৃহীত তথ্য** : অনেক সময় গবেষক নির্ধারিত কতকগুলি প্রশ্ন উত্তরের জায়গা শূন্য রেখে সম্ভাব্য তথ্য সরবরাহকারী ব্যক্তিদের কাছে প্রেরিত হয়। এগুলি আবার গবেষকের কাছে ফেরৎ এলে সেগুলি একত্র রেখে দেওয়া হয়। সাহিত্য বা সাহিত্যিক সম্পর্কে পাঠকের চেতনা বিচারের ক্ষেত্রে প্রশ্নাবলী দ্বারা গৃহীত তথ্যগুলির মূল্য নিতান্ত কম নয়।

১২. **বস্তুর মাধ্যমে গৃহীত তথ্য** : সমাধিস্থান বা মন্দির গাত্র ইত্যাদির ফলক, সাহিত্যিকের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ইত্যাদির মাধ্যমেও সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য আহৃত হতে পারে।

১৩. **বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের মাধ্যমে গৃহীত তথ্য** : আধুনিক যুগের সাহিত্য গবেষণা বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে এককভাবে দাঁড়াতে পারে না। বিভিন্ন জাতীয় প্রয়োগের মাধ্যমে অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও সন্দেহের নিরসন হয়। এমন কি লৈখিক তথ্যের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বহু কাল্পনিক উক্তিকে অতীতের বক্তব্য হিসেবে সত্য বলে সিদ্ধান্ত করতে গিয়েও বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে অসত্য প্রমাণিত হয়।

এগুলি ছাড়া বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য এসে যেতে পারে—যা গবেষণার প্রকৃতি অনুযায়ী কাজে লাগে কিংবা কাজে লাগে না।

৪. গবেষণা সহায়ক সার্ভিস

গবেষণার সহায়তার জন্য বিদেশে বিভিন্ন সংস্থা থেকে সার্ভিস পাওয়া যায়। এদেশে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে হয়তো আছে, তবে প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। এগুলি সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে।

১. **ব্যাক্ আপ্ সার্ভিস:** ব্যাক্ আপ্ সার্ভিস সাধারণতঃ তিন ধরনের হয়ে থাকে —

ক. **তথ্য সরবরাহ সার্ভিস**

খ. **অনুবাদ সার্ভিস**

গ. **রেপোগ্রাফী**

ক. **তথ্য সরবরাহ সার্ভিস:** এই জাতীয় সার্ভিসের মাধ্যমে গবেষক বহু দূরের গ্রন্থাগার থেকে তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্য লাভ করতে পারেন। বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা থাকার জন্য গবেষকের পক্ষে দূরে যাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। ব্যাক আপ সার্ভিসের অন্তর্গত তথ্য সরবরাহ সার্ভিস গবেষককে সে বিষয়ে সহায়তা করে গবেষকের সময় বাঁচিয়ে দেয় এবং গবেষক সে সময়টিকে গবেষণার অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারেন। যেমন, বিলেতের ইণ্ডিয়া অফিসের অনেক ডকুমেণ্ট সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে এই সহায়তার মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে।

খ **অনুবাদ-সার্ভিস:** আমরা পৃথিবীর সব ভাষা জানি না এবং জানা সম্ভবও নয়। অথচ সে সব ভাষায় সাহিত্য ও সাহিত্য-আলোচনামূলক গ্রন্থ রচিত হয়েছে—যা সাহিত্য-গবেষণায় প্রয়োজনীয়। গবেষক যদি ইচ্ছা করেন, তবে এই জাতীয় সার্ভিসের মাধ্যমে সেই সব গ্রন্থাদির সহায়তা পেতে পারেন।

গ. **রেপোগ্রাফী:** সাহিত্য-গবেষণার ক্ষেত্রেও অন্যান্য ধরনের গবেষণার মতো রেপোগ্রাফীর সহায়তা অনেক উপকার করতে পারে। এর মাধ্যমে সহজে কপি তৈরী করা যায়। মূল লেখা যে ভাষাই হোক লেখার সঙ্গে ছাপা 'ছবি, মানচিত্রের অবিকল কপি—ইত্যাদি পাওয়া

যায়। লেখা না ছেপে কম খরচে লেখার হুবহু কপি প্রস্তুত করা যায়। লেখা বা ছবিকে এর মাধ্যমে প্রয়োজন মতো ছোটো বা বড়ো করা যায়। মূল বই, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি না পাঠিয়ে এর মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য কোনো দূরবর্তী স্থানে সেগুলির কপি পাঠানো যায়। ফলে মূল কপি খোয়া যাওয়ার সম্ভাবনা বা আংশিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। এর মাধ্যমে বিভিন্ন সংগ্রহের মধ্যে পারস্পরিক ঋণ গ্রহণে অসুবিধা থাকে না।

২. **গ্রন্থাগার সমন্বয়ী সংস্থা**: এই জাতীয় সংস্থা বিভিন্ন গ্রন্থাগারের অপূর্ণতা ও পরিপূরকতা সম্পর্কে গবেষককে অবহিত করতে পারে। ফলে এই জাতীয় সংস্থার মাধ্যমে গবেষকদের যেমন সময় বাঁচে, তেমনি অপ্রত্যাশিত ভাবে বহু নতুন তথ্যও গবেষক জানতে পারেন।

৩. **তথ্য সংগ্রহ সমন্বয়ী সংস্থা**: বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তির কাছে গ্রন্থ ও অন্যান্য মূল্যবান্ তথ্য সংগৃহীত থাকে। এই সমন্বয়ী সংস্থা সেগুলি সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করে থাকে। বিভিন্ন সংগ্রহশালার অপূর্ণতা ও পরিপূরকতা সম্পর্কে গবেষককে অবহিত করে পূর্বোল্লিখিত ভাবেই গবেষকের যথেষ্ট উপকার করে থাকে।

৪. **গ্রন্থাগারিক সার্ভিস**: বিদেশে গবেষকদের গ্রন্থপাঠের ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য গ্রন্থাগারিক নিয়োজিত ব্যক্তি থাকেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে গবেষক অতি সহজেই প্রয়োজনীয় গ্রন্থ নির্বাচন করে পাঠ করতে পারেন। অনেক সময় গবেষকের ইচ্ছায় নির্দেশক গ্রন্থের সংগৃহীত নির্যাসও দেখিয়ে থাকেন গ্রন্থনির্যাস পঞ্জী থেকে। Readers' guidance ছাড়া Referral Serviceও বিদেশে রয়েছে। বিশেষ গ্রন্থাগারটিতে বিশেষ কোনো বই বা তথ্য না থাকলে অন্য কোন্ গ্রন্থাগারে সেই বিশেষ বই বা তথ্য পাওয়া যাবে, Referral Service-এর মাধ্যমে গবেষকরা তার সন্ধান পেয়ে থাকেন।

৫. **অর্থনৈতিক সহায়ক সংস্থা :** সরকারী ও বেসরকারী কিছু সংস্থা থাকে। এই সংস্থাগুলি অর্থনৈতিক অসুবিধার ক্ষেত্রে গবেষককে ঋণ বা অনুদান হিসেবে অর্থ সরবরাহ করে থাকে। অনেক গবেষক অর্থাভাবে গবেষণার কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু এই জাতীয় সংস্থা যদি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে সেই সব গবেষণার কাজ অব্যাহত রাখা যায়।

৬. **জন সরবরাহ মূলক সার্ভিস :** অনেক সময় ফিল্ড্ওয়ার্কের জন্য সহায়তাকারীর দরকার হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে এই জাতীয় সেবাপ্রতিষ্ঠান গবেষককে সহায়তা করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা সাধারণতঃ আদর্শবাদী ও স্বেচ্ছাসেবী ছাত্র। ছুটির অবকাশে তাঁরা এই কাজ করেন। এদেশের মানসিকতার ঠিক উল্টো। বিদেশে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান আছে।

তাছাড়া বিদেশে গবেষণা সহায়তাকারী বিচিত্র ধরনের সেবা সংস্থা আছে, যেগুলি আমাদের কল্পনার বাইরে। যেমন, একই বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সূচীপত্র সরবরাহ, চলমান গবেষণার তালিকা সরবরাহ, গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে অত্যাধুনিক সংবাদ সরবরাহ, বিভিন্ন সেমিনারের সংবাদ সরবরাহ, News clippings ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের সার্ভিস বিদেশের গবেষণা জগৎকে অনেক উন্নত করে তুলেছে।

---

৫. গবেষকের কিছু গ্রহণীয় পদ্ধতি

যাঁরা সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। সাহিত্য-গবেষণায় ব্যাপকভাবে কম্পিউটার ব্যবহারের যুগ এখনো আসে নি। সেসব ক্ষেত্রে নতুন কিছু পদ্ধতির প্রসঙ্গ এসে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের এই দীন পরিবেশে সামান্য কিছু সরল ও বাস্তব পদ্ধতি উল্লেখ করা ছাড়া গ্রন্থকারের আর কিছু করণীয় নেই। পরবর্তীকালে গ্রন্থান্তরে সাহিত্য গবেষণার জটিল পদ্ধতি ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনার ইচ্ছা বর্তমান গ্রন্থকার মনে পোষণ করেন।

এখানে কতকগুলি পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বিবরণ দেওয়া হলো।—

১. **সূচীকরণ**: সূচীকরণ গবেষকদের গৃহীত পদ্ধতি বিশেষ। যে ক্ষেত্রে প্রস্তুত সূচী নেই, সেক্ষেত্রে গবেষকের দ্বারা সূচীকরণ পদ্ধতি গৃহীত হয়।

কতকগুলি সঙ্কলন গ্রন্থ আছে। এগুলির নামকরণ থেকে বোঝা যায় না যে এই গ্রন্থে কী কী বিষয় সঙ্কলিত হয়েছে। সূচীকরণ থেকে গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়। অনেক সময় সঙ্কলন গ্রন্থ না হলেও নিজ প্রদত্ত শিরোনামে বক্তব্যের সূচী করা যেতে পারে। সাময়িকপত্রে বিভিন্ন বিষয় সন্নিবিষ্ট থাকে। এই বিষয়গুলির সূচীকরণ গবেষণার পক্ষে প্রয়োজন ঘটে।

২. **তালিকাকরণ**: গবেষকেরা বিভিন্ন ধরনের তালিকা করে থাকেন। গুরুত্বের আপেক্ষিকতা অনুযায়ী, সম্পাদিত কিনা তদনুযায়ী —ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন তাতে নেওয়া হয়ে থাকে। এগুলোতে ক্রমিক সংখ্যা, বিভিন্ন জাতীয় বিভাজন ইত্যাদি থাকে। গ্রন্থের তালিকা, পত্র-পত্রিকার তালিকা, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উৎসের তালিকা, প্রাক্তন গবেষণার তালিকা, চলমান গবেষণার তালিকা, প্রয়োজনীয় বস্তুর তালিকা, জনসংযোগার্থে বিভিন্ন ঠিকানার

তালিকা,—ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের তালিকা গবেষককে রচনা করতে হয়।

৩. **সারকরণ:** বিভিন্ন বক্তব্যের সার করে নেওয়াকে সারকরণ বলা হয়ে থাকে। এক একটি গ্রন্থ পাঠান্তে এই সারকরণ পদ্ধতি গৃহীত হয়ে থাকে। এই সারকরণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে চিন্তাবিন্যাসের যেমন সুবিধা হয়, তেমনি সারকরণ ইঙ্গিত হিসেবে উপস্থিত হয়ে চিন্তা বিস্তারেরও সুবিধা করে দেয়।

৪. **উদ্ধৃতি সংগ্রহ:** একটি গ্রন্থ পাঠ করতে গিয়ে এক একটি বক্তব্য গ্রন্থকারের উপস্থাপিত যথাযথ ভাষায় নোট রাখতে হয়। এর সঙ্গে গ্রন্থের নাম, লেখকের নাম, প্রকাশ স্থানের নাম, প্রকাশকাল সংস্করণ ও পৃষ্ঠা সংখ্যাও নোট করা উচিত। নিজস্ব বক্তব্যের সমর্থনে এই উদ্ধৃতিগুলির প্রয়োজন হতে পারে। উদ্ধৃতির উদ্ধৃতি হলে উৎসের ঋণ স্বীকার করা উচিত।

৫. **উৎস সন্ধান:** উৎস সন্ধানে গবেষকের প্রচুর কালক্ষেপ ঘটে। গবেষণার বিষয়বস্তু বা গবেষণার প্রকৃতি অনুযায়ী কাম্য উৎসের বিষয়ে সম্ভাব্য নোট তৈরী করতে হয়। যাঁরা তত্ত্বাবধায়কের অধীনে গবেষণা করেন, তত্ত্বাবধায়ক তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও ধ্যানধারণার ভিত্তিতে কিছু কিছু উৎস সন্ধান নির্দেশ করে দেবেন। কোন্ অনুমানে কীভাবে অথবা কী কারণে তিনি এ ধরনের নির্দেশ দিচ্ছেন, তাও ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন। এতে উৎস সন্ধানের ক্ষেত্রে গবেষকের নিজস্ব বোধ সৃষ্টি হবে। যে ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক নেই, কিংবা যে ক্ষেত্রে গবেষক তত্ত্বাবধায়কের দুর্বলতা উপলব্ধি করেন, সেক্ষেত্রে তাঁকে জনসংযোগ ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির ঠিকানা সংগ্রহ করতে হবে এবং তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী উৎস সন্ধান করতে হবে। সন্ধান-গত উৎস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নোট রাখতে হবে এবং উৎস ব্যবহারান্তে প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গেও পরে প্রয়োজনীয় নোট থাকবে এবং উৎসের তালিকায় তা সম্পাদিত হিসেবে চিহ্নিত থাকবে।

৬. **ফাইল-পদ্ধতি :** বিভিন্ন জাতীয় তথ্য বা তত্ত্বের জন্য এক একটি ফাইল থাকবে। এগুলির পশ্চাৎ দেশে পেন্সিলে কোন্ বিষয়ের ফাইল, তা চিহ্নিত করা থাকবে। গবেষণার পদক্ষেপে বিষয় বিন্যাস একাধিকবার হয়ে থাকতে পারে। তদনুযায়ী ফাইলও কম বা বেশি করা হতে পারে। তখন ফাইলের পেছনে পেন্সিলে লেখা চিহ্নিত বক্তব্য ইরেজ করে নতুন বক্তব্য লিখতে হয়। গবেষণার শেষ পর্বে এক একটি ফাইলে গৃহীত তথ্য বারবার পড়তে হয়। তারই মাধ্যমে সেই ফাইল সংক্রান্ত বিষয়ের একটা সংহত বোধও এসে যাবে। বস্তুতঃ চিন্তার বিন্যাস এবং বিন্যস্ত চিন্তার বিষয়ে গভীর মনঃসংযোগের জন্য ফাইল সিস্টেমের নিতান্তই প্রয়োজন।

৭. **খাম-পদ্ধতি :** এক একটি ফাইলের সঙ্গে এক একটি বড়ো আকারের নতুন বা পুরোনো শক্ত খাম রাখা যেতে পারে। অনেক সময় গবেষক সংযোগ অভাবে বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য একসঙ্গে টুকে নিতে বাধ্য হন। যে সব তথ্য একসঙ্গে টোকা হয়, সেগুলি এক পৃষ্ঠাতে টোকা ভালো, পেছনের পৃষ্ঠা সাদা থাকবে। পরে অবসর সময়ে পৃষ্ঠাটির অংশগুলি ছিঁড়ে বিভিন্ন ফাইলে সন্নিহিত খামগুলিতে এক একটি বিষয় বা চিন্তাভিত্তিক ভাবে খামের চিহ্নিত অংশ দেখে ঢুকিয়ে রাখতে হয়। প্রয়োজনে ছিন্ন কাগজগুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংযুক্ত করতে হলে আলপিন ব্যবহার করা যেতে পারে।

৮. **স্লিপ-পদ্ধতি :** বাজার থেকে কিলো দরে ছাঁট কাগজ এনে ছাপাখানা থেকে কাটিং করিয়ে নিয়ে বেশ কিছু স্লিপ তৈরী করে রেখে দিতে হয়। গবেষণার কাজে এই স্লিপগুলি কাজে এসে যায়।

বর্ণানুক্রমিক তালিকা-প্রণয়নে এগুলির যথেষ্ট ভূমিকা আছে। মেঝেতে চক দিয়ে প্রথমে গোটা আষ্টেক ঘর কেটে নিতে হবে। ঘরগুলি অন্ততঃ ফাইলের সাইজে হবে। এবারে যথাক্রমে—

১. স্বরবর্ণ ২. ক-এর লাইন ৩. চ-এর লাইন ৪. ট-এর লাইন ৫. ত এর লাইন ৬. প-এর লাইন ৭. য থেকে শেষ ৮. ফাঁকা থাকবে। বর্গীয় ব-এর মধ্যে অন্তঃস্থ ব রাখা হবে। স্লিপ্ শর্টিং হয়ে

গেলে সেগুলি আলাদাভাবে গুছিয়ে তুলে নিতে হবে। স্লিপগুলি বিভিন্ন ঘরে রাখার সময় পেপারওয়েট্‌ কিংবা ঐ ধরনের কিছু দিয়ে চাপা দিতে হবে।

এর পর এক একটি গোছা নিয়ে নতুন করে শর্টিং করতে হবে। যেমন অ, আ ইত্যাদি, কিংবা ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি।

ইংরেজী বর্ণমালার ক্ষেত্রে এক একটি ঘরে প্রথমে A-B-C-D, E-F-G-H, ইত্যাদি করে স্লিপ শর্টিং করতে হবে। শেষের ঘরে U-V-W-X-Y-Z থাকবে। দ্বিতীয় বারে আবার A-B-C-D গুচ্ছ ইত্যাদিকে বিভিন্ন ঘরে A, B, C, D—ইত্যাদি ঘরে শর্টিং করতে হবে। ছোটো গুচ্ছ হাতে এলে শব্দের ২য় বর্ণের অনুক্রম ৩য় বর্ণের অনুক্রম ইত্যাদি বিচার করা সম্ভব হয়।

চিন্তা বিন্যাসেও স্লিপ কার্যকর। ফাইলে রক্ষিত চিন্তাগুলি স্লিপ-এ ইঙ্গিত আকারে থাকবে এবং স্লিপ ও ফাইলে লাল ডটপেনের কালিতে নম্বর দেওয়া থাকবে। চিন্তাগুলি ছকে ফেলার সম্পর্কে একটু ভেবে নিয়ে চকে আঁকা এক একটি ঘরে চিন্তার মূল শিরোনাম থাকবে। তদনুযায়ী চিন্তার ইঙ্গিত ও নম্বর-যুক্ত স্লিপ বিভিন্ন ঘরে ফেলতে হয়। স্লিপের ছোটো বাণ্ডিল গার্টার দিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে। এর পরে ফাইলের চিন্তাগুলি নম্বর অনুযায়ী গুছিয়ে ফেলতে হবে।

৯. **নিউজ-ক্লিপিংস :** প্রতিদিনের সংবাদপত্রগুলি সংরক্ষণ করা সম্ভবপর হয় না। তাই বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ বাছাই করে বিশেষ বিষয়ের সংবাদ বেছে ও কেটে ক্রম অনুযায়ী সাজাতে হয়। যে পাঠাগার সংবাদপত্র সংরক্ষণ করে না, সেই পাঠাগারের সঙ্গে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাছাড়া পুরোনো কাগজ-ওয়ালার স্টকও এ-ব্যাপারে সহায়তা করে থাকে।

১০. **রিপোর্টিং পদ্ধতি :** সংবাদ-বিজ্ঞানে রিপোর্টের শ্রেণীবিভাগ আছে। এমন কি প্রতিটি শ্রেণী সম্পর্কে নিয়মও আছে। তবে

আজকাল এই নিয়ম মানা হয় না। সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে রিপোর্টিং পদ্ধতি এক বিশেষ ছাঁচের হয়ে থাকে। তবে গবেষণার প্রকৃতি অনুযায়ী এর কিছু পরিবর্তনও ঘটতে পারে।

সাধারণ ভাবে সাহিত্য গবেষণায় নিম্নোক্ত ক্রম লক্ষ্য করা যায় :—

ক. যাকে বা যে বিষয় নিয়ে রিপোর্টিং হবে, তার অবস্থান সম্পর্কে ভূমিকায় কিছু আভাস দেওয়া এই জাতীয় রিপোর্টে করণীয় দিক।

খ. এর পর এর বাইরের বর্ণনা থাকবে। বর্তমানে এর কোন্ রূপ সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ করে থাকে, তার বর্ণনা এই অংশে থাকে।

গ. এই অংশে থাকে এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বক্তব্য পরিবেশনে ইতিহাস জনশ্রুতি ইত্যাদির উল্লেখের জন্য জন-সংযোগ এবং গ্রন্থপাঠ উভয় কাজই সহায়তা করে থাকে।

ঘ. এই অংশে থাকে বিষয় সম্পর্কে গবেষকের ব্যক্তিগত অনুভূতি। অবশ্য যেক্ষেত্রে এই বক্তব্য প্রকাশের অবকাশ আছে, সে ক্ষেত্রেই তা প্রকাশ করতে হবে।

ঙ বিষয়ের বিভিন্ন দিকের গুরুত্ব, বিশেষতঃ সাহিত্যগত গুরুত্বই এই অংশে প্রধানভাবে আলোচিত হবে।

১১. **পরিসংখ্যান পদ্ধতি :** সাহিত্য-গবেষণায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান পদ্ধতির প্রয়োজন ঘটে। শব্দ ব্যবহার, অলঙ্কার প্রয়োগ ইত্যাদি বাহিরঙ্গগত ক্ষেত্রে প্রবণতা বিচার ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবণতা বিচারেও পরিসংখ্যানের দরকার হয়। যেক্ষেত্রে সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ, অর্থনীতি ইত্যাদি অন্যান্য দিক জড়িত সেক্ষেত্রে পরিসংখ্যানে সমাজবিজ্ঞান ও অর্থবিজ্ঞানের পরিসংখ্যান রীতি গৃহীত হতে পারে।

তবে সাধারণ সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে প্রথমে পরিধি নির্ধারণ করতে হয়। তারপর পৃথক পৃথক বিষয়ে পরিসংখ্যান একসঙ্গে করা

যেতে পারে পৃথক পৃথক কাগজে। পরিধি সাধারণত দু'ধরনের হয়ে থাকে।—

ক. **গ্রন্থ পরিধি**

খ. **ব্যক্তি-পরিধি**

গ্রন্থ পরিধিভুক্ত পরিসংখ্যানের জন্য সাধারণতঃ গ্রন্থাদি ব্যবহার এবং ব্যক্তি পরিধিভুক্ত পরিসংখ্যানের জন্য জন-সংযোগ দরকার হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ধরনের পরিধিভুক্ত পরিসংখ্যানে গ্রন্থাদি ব্যবহারেরও দরকার হতে পারে। তাছাড়া কাল পরিধি, স্থান পরিধি ইত্যাদির অবকাশ থাকতে পারে।

১২. **ডায়ারি সিস্টেম**: প্রতি গবেষক তাঁর কাজের জন্য নোট-খাতা সদা-সর্বদা কাছে রাখবেন তেমনি পরিকল্পিত প্রতিদিনের কাজগুলি পূর্বে ডায়ারির পৃষ্ঠায় লেখা থাকবে। তারিখ অনুযায়ী যোগাযোগের সুযোগগুলি সেইসব পৃষ্ঠায় এনগেজমেন্ট হিসাবে উল্লেখ করা থাকবে। কাজ শেষ হলে ডায়ারির পৃষ্ঠায় পরিকল্পিত বিষয়ে টিক মার্ক থাকবে। সাধারণ ডায়ারির মতো কাজ সমাপনান্তে প্রয়োজনীয় মন্তব্য শেষে লেখা যেতে পারে তবে অন্য কালিতে।

১৩. **পুঁথির পাণ্ডুলিপি পঠন**: আমরা আমাদের নিজেদের ভাষার হরফ সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান রাখি। মুদ্রিত হরফের মধ্যে তেমন হেরফের নেই। কিন্তু পুঁথি পড়তে আমাদের অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন হরফ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা মোটামুটি ধারণা দিয়ে থাকেন। প্রাচীন পুঁথি পড়ার অভ্যাস করতে হলে আধুনিক পুঁথির থেকে ক্রমে ক্রমে প্রাচীন পুঁথির দিকে এগোতে হবে। অক্ষরের ছাঁদে যে বিবর্তন এসেছে উজানমুখী পঠনের মধ্য দিয়ে তা স্বাভাবিকভাবেই ধরা পড়বে। অবশ্য ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান, অপ্রচলিত শব্দ জ্ঞান, সাধারণ বোধ ইত্যাদির দরকার ঘটে পুঁথির পাণ্ডুলিপি পঠনের ক্ষেত্রে।

১৪. **লাইব্রেরী-ওয়ার্ক**: লাইব্রেরী ওয়ার্ক সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে পদ্ধতি হিসেবে সবচেয়ে বেশি গৃহীত হয়ে থাকে এবং অধিকাংশ

সাহিত্য-গবেষকই এই পদ্ধতিই প্রধানভাবে অবলম্বন করে থাকেন। দু'ধরনের পাঠাগার আছে,—(ক) সাধারণ পাঠাগার (খ) ব্যক্তিগত পাঠাগার। গবেষককে বহু পাঠাগারের সুযোগ নিতে হয়। তাঁর পক্ষে প্রতি পাঠাগারে গ্রন্থপাঠের জন্য অর্থব্যয় করে সদস্য হওয়া সম্ভব নয়। এ-সব সমস্যার ক্ষেত্রে গবেষক যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হিসেবে একটা পরিচিতিপত্র কাছে রাখেন। যেসব কাগজপত্র বা দলিল সর্বসাধারণের ব্যবহার্য নয়, উক্ত পরিচিতি-পত্রের মাধ্যমে এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে সেগুলিও ব্যবহার করা সম্ভব হয়। গ্রন্থাগারে গিয়ে প্রথমেই গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে আলোচনা করে নিলে সুবিধা হয়। বড়ো বড়ো গ্রন্থাগারে যাতায়াতের মাধ্যমে সমগোত্রীয় কিছু কিছু গবেষকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়। লাইব্রেরী ওয়ার্কের ক্ষেত্রে তাঁরাও সহায়তা করে থাকেন। গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার অনেক সময় গবেষককে বাড়তি সুযোগ সুবিধা এনে দেয় এমনকি সময়ের অপব্যয় থেকেও গবেষককে মুক্তি দেয়।

বিভিন্ন সূত্র থেকে পাঠাগারের তালিকা পাওয়া যায়। সেগুলি থেকে প্রয়োজনীয় পাঠাগারের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। পাঠাগারের পথনির্দেশ যাতায়াতের সময় ইত্যাদি জেনে নিতে হবে। পাঠাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুটি পর্ব আছে।

প্রথম : পাঠাগারে গিয়ে গ্রন্থাগারিক অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। সংগ্রহের পরিমাণ প্রকৃতি, গুরুত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন দিক বিচার করে পাঠাগারের গ্রন্থ তালিকা ওল্টাতে হয়। গ্রন্থ তালিকার বৈকল্পিক পদ্ধতি থাকলেও তা দেখে নিতে হয়। পাঠাগারে পাঠের সময়, বন্ধের দিন এবং অন্যান্য নিয়মকানুন জেনে নিয়ে পাঠাগার সংক্রান্ত তালিকার পাশে নোট রাখতে হবে। পাঠাগারের সুযোগ গ্রহণের দিনক্ষণ আগের থেকে জানিয়ে রাখা ও অন্যান্য ব্যবস্থা করে রাখা ভালো। পাঠাগার অপ্রয়োজনীয় বোধ হলে এগুলির প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয়: এই পর্বে যথারীতি নির্দিষ্ট দিনে পাঠাগারে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পাঠাগারে যেতে হয়। এই সময় প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ বই ও পত্রপত্রিকার তালিকা এবং বইয়ের নাম্বার ইত্যাদি তালিকা আকারে টুকে নিতে হয়। সম্ভাব্য বলে সন্দেহ হলে জিজ্ঞাসা-চিহ্নসহ তালিকাভুক্ত করতে হবে। তারপর গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকাদি পাঠ, সারকরণ, উদ্ধৃতি সংগ্রহ, অন্যান্য বিভিন্ন তথ্য গ্রহণ ইত্যাদি এই পর্বের করণীয় বিষয়। যেখানে Readers Guidance এবং Referral Service-এর সুযোগ আছে, সেখানে তা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করতে হয়। নির্দিষ্ট পাঠাগার ব্যবহার সমাপ্ত হলে নিজের কাছে রক্ষিত পাঠাগারের তালিকায় 'টিক্' চিহ্ন দিতে হয়। যে পাঠাগার অপ্রয়োজনীয় বলে প্রতিভাত হয়েছে, তার পাশে 'ক্রস্' চিহ্ন দেওয়া হবে। পাঠাগারের তালিকার পাশে গবেষকের ব্যক্তিগত মন্তব্য থাকতে পারে।

তথ্যের File-এ তথ্যের সঙ্গে পাঠাগারের নাম বা বইয়ের নাম্বার ইত্যাদি 'অধিকন্তু' হিসেবে থাকবে—যদিও প্রকৃত গবেষণায় উপস্থাপিত তথ্যে তা থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে, পর্যাপ্ত নয় ভেবে আবার যদি পাঠাগারে গিয়ে একই বই খুঁজতে হয়, তাহলে এই সঙ্কেত পরিশ্রম বাঁচাবে। তথ্যের File-এ পাঠাগারের সম্ভাব্য তথ্য সম্পর্কে এবং আনুষঙ্গিক সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে নোট থাকতে পারে।

১৫. **প্রত্যক্ষ তথ্য-সংগ্রহ পদ্ধতি:** প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়।—

ক. সাধারণ শ্রবণ-দর্শন জনিত তথ্যসমূহ

খ. প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ

গ. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ

ক. অনেক সময় গবেষক যে কোনো লোকসাহিত্য-ভিত্তিক কোনো অনুষ্ঠানে থেকে দর্শক বা শ্রোতা হিসেবে পরিবেশন বৈশিষ্ট্য রসিক-গোষ্ঠীর প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্য

সংগ্রহের জন্য কোনো ব্যক্তিগত যোগাযোগ না করে শুধু উপস্থিতির মাধ্যমে গবেষক পদক্ষেপ করতে পারেন।

খ. প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে তথ্য-সংগ্রহ দুভাবে করা যায়।—

(অ) নির্দিষ্ট উত্তরাবলী সূচক পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নাবলী

(আ) অনির্দিষ্ট উত্তরাবলী সূচক পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নাবলী

গবেষক তাঁর পরিকল্পনামতো কিছু প্রশ্ন মুদ্রিত করে নেবেন। প্রশ্নের সঙ্গে হ্যাঁ, না—ইত্যাদি সূচক কিছু উত্তর থাকবে। প্রশ্নপত্রগুলি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে বিতারিত করা হবে। তাঁরা নির্দিষ্ট উত্তরে টিক মার্ক দিয়ে উত্তর নির্দিষ্ট করে গবেষকের কাছে পাঠাবেন। অবশ্য এই জাতীয় গবেষণা শিক্ষিত বা স্বাক্ষর গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই সম্ভব। তাই একজন ব্যক্তির সহায়তায় বিভিন্ন তথ্যের সঙ্গে মৌখিকভাবে প্রশ্ন উপস্থাপন করে নিজেকেই উত্তরে টিক মার্ক দিতে হয়।

আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে প্রশ্নাবলী থাকে এবং প্রতি প্রশ্নের পর ফাঁকা অংশ থাকে। প্রশ্নের প্রাপক তাঁর নিজস্ব বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে স্বাধীনভাবে দেবেন। এই রীতির সুবিধা ও অসুবিধা—দুইই আছে। সুবিধা এই যে, শুধু হ্যাঁ বা না-র মাধ্যমে অনেক স্বেচ্ছাকৃত তথ্য সরবরাহ ব্যাহত হয়। অনেক সময় কর্মস্থলে নতুন প্রশ্ন গবেষকের মনে উদয় হতে পারে, তার পথ এতে বন্ধ থাকে। তাছাড়া অনেকে নিজস্ব উদ্যোগে অনেকে কিছু বক্তব্য বলতে চান না—নিতান্ত সঙ্কোচবশতঃ অথচ হ্যাঁ—না ইত্যাদি উত্তরাবলী থাকলে উত্তর পাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয় না।

গ. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনেকখানি সুযোগ দিয়ে থাকে। এই পদ্ধতিকেও দুভাগে ভাগ করা যায়।

(অ) নির্দিষ্ট প্রশ্নাবলী সম্পর্কে চেতনা রেখে সাক্ষাৎকার

(আ) সাধারণ ঘনিষ্ঠ সংযোগের মাধ্যমে তথ্য-আহরণ

সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নাবলীর পাশাপাশি গৌণ

প্রশ্নগুলির মাধ্যমে চাহিদা মেটানো যায়। উত্তর ইচ্ছামতো বিস্তৃত-ভাবে পাওয়া সম্ভব হয়।

ঘনিষ্ঠ সংযোগের মাধ্যমে অনেক প্রশ্ন প্রত্যক্ষভাবে গবেষকের মনে জেগে উঠতে পারে এবং সে সব প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া সম্ভব হয়।

একটি সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে গবেষক দু'রকম পদ্ধতি পর পর গ্রহণ করতে পারেন। যেক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার একটি অথবা অল্প দুই একটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, সে ক্ষেত্রে সেগুলির নথি হিসেবে গুরুত্ব থাকে যথেষ্ট। এ সব ক্ষেত্রে যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার তার দেওয়া উত্তরগুলি যে নির্ভুল, তার প্রমাণ হিসেবে তাঁর স্বাক্ষর দরকার হয়ে পড়ে।

১৬. **বস্তু সংগ্রহ**: বস্তু-সংগ্রহের মাধ্যমে তথ্য আহরণ করা সম্ভব হয়। অনেকে অনেক বস্তু নিতান্তই—'আছে-থাক্' মানসিকতায় সংরক্ষণ করে থাকেন। গবেষক তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রে সেগুলির গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলে অনেকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে সেগুলি গবেষককে উপহার দেন। অনেকের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করে ধার হিসেবে সেগুলি নিয়ে আসা যায়। অনেকে সুযোগ বুঝে সেই সব বস্তু বিক্রী করতে চান, আর্থিক সামর্থ্য বুঝে, গুরুত্ব বুঝে দরাদরি করে গবেষক তা কিনে নিতে পারেন। নিতান্ত অসুবিধার ক্ষেত্রে তার প্রতিরূপ নিয়ে আসতে হয়। সংস্কার বশতঃ অনেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্রব্য স্পর্শ করতে দেন না। তখন সংরক্ষণকারীর সহায়তাতেই সেই বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান সংগ্রহ ছাড়া উপায় থাকে না। তবু বুঝিয়ে তাঁকে রাজী করানো যায়,—গবেষণার মহৎ উদ্দেশ্য জানিয়ে, এবং—সংরক্ষণকারীর কথা তুলে ধরা হবে—এই প্রলোভন দেখিয়ে।

১৭. **সংকেত চিহ্নের ব্যবহার**: অনেকসময় সংগৃহীত তথ্য বা চিহ্নিত বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য বেশি থাকায় ক. শ্রম বাড়ে খ. স্লিপ-শর্টিং-এ অসুবিধা হয়। এসব ক্ষেত্রে ১. বর্ণমালা দিয়ে ২. সংখ্যা দিয়ে ৩. বক্তব্যের প্রথম শব্দ দিয়ে, ৪. বক্তব্যের ইঙ্গিতবহ শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দিয়ে—এই চারটির যে কোনো একটি পদ্ধতির মাধ্যমে স্লিপ্ শর্টিং-এর মাধ্যমে তথ্য বা চিহ্নিত বিষয় বিন্যাস করা যায়। পূর্ণ

বক্তব্যের মার্জিনে লাল কালিতে সংকেত চিহ্ন দেওয়া হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য সংখ্যা ও বর্ণমালা মূল তথ্যের বা চিহ্নিত বিষয়ের ফাইল ক্রমিক হিসেবে থাকবে। গবেষণার ক্ষেত্রে অবস্থা বুঝে গবেষককে অনেক নতুন নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। এইসব পদ্ধতি গবেষক স্বয়ং উদ্ভাবন করে থাকেন। তাই সব সময়ে ছকে বাঁধা পদ্ধতি ধরে গবেষণার কাজ চলে না।

---

৬. সাহিত্য-গবেষণার পদক্ষেপ-ভেদ

গবেষণার জন্য কতকগুলি পদ্ধতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। পদ্ধতিগুলির ক্ষেত্র বিন্যাস-ক্রম, সমবায়িকতা,—এমন কি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন স্ব-পরিকল্পিত কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করা চলে। পদক্ষেপের দিক বিচার করে দেখা যায় যে, গবেষণার পদ্ধতি বিন্যাসকে মূলতঃ দুটি দিক নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।—

১. গবেষণার উপাদান

২. গবেষণার প্রকৃতি

উপাদান-ভিত্তিক ভাবে গবেষণার পদক্ষেপ চার প্রকার।—

১. মৌখিক সাহিত্য ভিত্তিক

২. পাণ্ডুলিপি ও পুঁথিভিত্তিক

৩. মুদ্রিত গ্রন্থাদি ভিত্তিক

৪. বিমিশ্র উপাদান ভিত্তিক

মৌখিক সাহিত্য : মৌখিক সাহিত্যের—অন্ততঃ পুরোনো দিনের লভ্য মৌখিক সাহিত্যের অধিকাংশই এখন সংকলন-গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় সংরক্ষিত হওয়ায় সাধারণ সাহিত্য-গবেষকের কাছে তা এখন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ভিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এদেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা অর্ধেকের অনেক বেশি। তাদের মধ্যে সাহিত্য সৃষ্টির বাসনা থাকাও অস্বাভাবিক নয়। তবে এই জাতীয় সাহিত্য রচনার আগ্রহ অনেক কমে গেছে। এর কতকগুলি কারণ আছে।—

১. চাষের সংখ্যা বেড়েছে। নিরক্ষর মানুষদের মধ্যে অধিকাংশই ক্ষেতমজুর চাষী। এদের অবসর বিনোদনের অবকাশ কমে গেছে।

২. অর্থনৈতিক চাপে চাষ ছাড়া অন্যান্য উপার্জনের চেষ্টায় এরা ব্যস্ত। তাই মৌখিক সাহিত্য রচনার অবকাশ তেমন নেই।

৩. রেডিও সিনেমা ইত্যাদি এদের মনের দরজায় এসে যাওয়ায়

এদের রুচির পরিবর্তন হয়েছে। ইচ্ছামতো সময়ে এবং কম সময়ে এরা নতুন ধরনের রস আস্বাদনে আগ্রহী।

৪. এদের মধ্যে রাজনৈতিক দলাদলি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা অনেক বেড়ে গেছে। ফলে সামাজিকতা ও সংহতি অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়ে গেছে।

৫. দৈহিক অপুষ্টি ও মানসিক অশান্তির জন্য স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতা এসে যাওয়ায় মৌখিক সাহিত্য স্মৃতিতে ধারণ করবার ক্ষমতা এদের এখন তেমন নেই।

একমাত্র বৃত্তিগত ভাবে যাঁরা নিরক্ষর সমাজে লোকসাহিত্য পরিবেশন করেন, তাঁদের অনেকেই সাক্ষর এবং তাঁদের পাণ্ডুলিপি আকারে খাতা আছে। অবশ্য প্রত্যন্ত প্রদেশের আদিবাসী সমাজের বেশ কিছু মৌখিক সাহিত্য এখনো বোধহয় উদ্ধারের অপেক্ষায় আছে। তবে সেগুলির মধ্যে অনেক কিছুকেই আবার বাংলা-সাহিত্যের মধ্যে ফেলা যাবে কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে।

ইতিমধ্যে যা আবিষ্কৃত হয়ে গেছে, সেগুলিতে নতুন তত্ত্ব আরোপের সুযোগ এখনো আছে এবং অনাবিষ্কৃত তথ্যও আবিষ্কৃত তথ্যের সঙ্গে যুক্ত করে নতুন কিছু চিন্তাভাবনারও সুযোগ নষ্ট হয় নি। গ্রামীণ মহিলা-সমাজের মৌখিক সাহিত্যের বেশ কিছু এখনো অনাবিষ্কৃত আছে বলে মনে হয়। অনালোকিত ও পর্দানসীন মুসলিম মহিলা-সমাজের মৌখিক সাহিত্যের প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে উল্লেখ করা চলে। নগর-ভিত্তিক মৌখিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবকাশ তেমন নেই।

মৌখিক সাহিত্যের গবেষকদের কিছু করণীয় দিক আছে। সেগুলি ক্রমান্বয়ে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

১. **গবেষণা-গ্রন্থ ও প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের সংবাদ :** লোকসাহিত্য গবেষণা সংক্রান্ত দেশী ও বিদেশী, সরকারী ও বেসরকারী পত্র পত্রিকা ও সংস্থা আছে। তাছাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিও আছে। এগুলির মাধ্যমে মৌখিক সাহিত্য সম্পর্কিত গবেষণা গ্রন্থের ও পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধের সংবাদ জানা যায়।

গবেষণা গ্রন্থ বা গবেষণা নিবন্ধে সন্নিবিষ্ট গবেষক কত গ্রন্থপঞ্জীও এ বিষয়ে সহায়তা করতে পারে।

২. **সংগৃহীত সাহিত্য সংকলন পর্যালোচনা :** অনেক গ্রন্থকার এবং পত্র পত্রিকার লেখক মৌখিক সাহিত্যের সংগ্রহ মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করে থাকেন। এগুলি পাঠ করা ও এগুলির উপস্থাপন রীতি কিংবা এগুলি সম্পর্কে আলোচনা মনোযোগ দিয়ে গবেষকদের পাঠ করা উচিত।

৩. **চলমান গবেষণা প্রক্রিয়ার সংবাদ :** সন্ধান নিয়ে মৌখিক সাহিত্য সম্পর্কে দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান গবেষণাগুলির নাম জানা উচিত। এই জাতীয় কিছু গবেষকের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের সুবিধা-অসুবিধা কিংবা তাঁদের গৃহীত প্রক্রিয়াগুলি নিয়ে একত্র আলোচনা করা যেতে পারে। লোক সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতি সম্পর্কিত সমকালীন কিছু দেশী বিদেশী পত্র-পত্রিকা পাঠ করলেও এ বিষয়ে কিছু উপকার পাওয়া যায়।

৪. **সম্ভাব্য সন্ধান :** মৌখিক সাহিত্য-সংগ্রাহকের উচিত সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করা এবং এগুলির মধ্য থেকে সম্ভাব্য সন্ধানগুলি স্থির করে নেওয়া। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মৌখিক সাহিত্য সংগ্রহ করা সম্ভব, সেগুলি ইতিমধ্যে সংগৃহীত হয়েছে কিনা, অথবা ইতিমধ্যে সংগৃহীত তথ্যগুলি পর্যাপ্ত কিনা, কিংবা বিভ্রান্তিমূলক কিনা, এগুলির মধ্যে নতুন কিছু তত্ত্ব আরোপ সম্ভব কিনা,—সন্ধান-বিচারের ক্ষেত্রে সে বিষয়েও চিন্তাভাবনা করা উচিত। মানচিত্র সংগ্রহ করে গবেষণার অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করতে হবে এবং সেখানকার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্কে অন্যান্য যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে।

৫. **প্রত্যক্ষ সংযোগ :** প্রত্যক্ষ সংযোগের ক্ষেত্রে দুধরনের পদ্ধতি নেওয়া চলে—

ক. **ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা**

খ. **টিম-ওয়ার্ক**

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা যেখানে, সেখানেও একজন বা দুজন সহকারী থাকলে ভালো হয়। টিম-ওয়ার্কে শ্রম ও সময় বাঁচে। পূর্বে একবার নির্দিষ্ট অঞ্চলে ভ্রমণ করে—যেদিন তথ্য সংগ্রহ করা হবে, সেই দিনটি সম্পর্কে তথ্য-পরিবেশকদের অবহিত করতে হবে। এমন-কি, কী ধরনের চাহিদা, সেটা আগের থেকে জানিয়ে দিলে তাঁরাও প্রস্তুত হতে পারেন। প্রশ্নাবলী, সাক্ষাৎকার, Audio Visual যন্ত্র অর্থাৎ Tape Recorder, V. C. R., Camera বা Movie Camera —সব কিছুই এই গবেষণায় দরকার হতে পারে।

৬. **মনঃসংযোগ :** তথ্য সংগ্রহের পর সংগৃহীত তথ্যগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে। প্রথমে তথ্যগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে। এরপর প্রত্যেকটি দিক নিয়ে পৃথক পৃথক চিন্তাভাবনা করতে হবে। মূল গৃহীত সাহিত্য এবং সাহিত্য-সম্পৃক্ত তথ্য—দুটির ক্ষেত্রেই এই ভাবে শ্রেণীবিভাগ করতে হবে। এরই ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থগুলির পৃষ্ঠা এলোমেলো ভাবে ওল্টাতে ওল্টাতে চিন্তা করতে হবে। মনে রাখা উচিত, এখানে ঐসব গ্রন্থ শুধু গবেষকের চিন্তাশক্তি উদ্রেকে সহায়তা করবে মাত্র। এগুলি মনোযোগ দিয়ে পাঠের তেমন প্রয়োজন নেই। হয়তো এসবের পাতা ওল্টানোর মধ্য দিয়েই কোনো সূত্র মাথায় এসে যেতে পারে। তাছাড়া এগুলির একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবও আছে—যা চিন্তাভাবনাকে সুবিন্যস্ত ও গভীর করতে সহায়তা করে।

৭. **পরিকল্পনা ও লিখন :** এর পর যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করে যা-কিছু লেখার, তা লিখে ফেলতে হবে। কিন্তু এই লেখা যে Final, সেটা ভেবে নেওয়া অনুচিত হবে। অবশ্য লেখা জিনিসটি বেশ কয়েকবার পড়লে আরো নতুন কিছু বক্তব্য নিজের লেখার মধ্যে সংযুক্ত হতে পারে। কিছু অংশ বাদ দিতেও ইচ্ছা হতে পারে। হয়তো কোনো অংশ কেটে নতুন করে লিখলে ভালো হয়—এই বোধ আসতে পারে।

মৌখিক সাহিত্যের সঙ্গে জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, অর্থনীতি,

অভিজাত সাহিত্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক, আঙ্গিক, ভাষা, উপস্থাপনা, মুদ্রাদোষ—বিভিন্ন দিক থেকে অনেক কিছুই চিন্তাভাবনা করবার থাকে।

সংগৃহীত সাহিত্যের বিষয়ে এই সব চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে এবারে এইসব চিন্তাভাবনা নিয়ে লেখা বইগুলি একটু পড়ে নেওয়া ভালো। পত্র-পত্রিকা পাঠের মধ্য দিয়েও উপকার পাওয়া যেতে পারে। গ্রন্থাগার ও বিভিন্ন সংস্থা এ বিষয়ে গবেষককে সহায়তা করতে পারে।

পাণ্ডুলিপি ও পুঁথি : পুঁথি যদিও পাণ্ডুলিপি শ্রেণীরই, তবু এখানে পাণ্ডুলিপিকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হলো। পাণ্ডুলিপি বলতে পুঁথি পরবর্তী যুগের অমুদ্রিত সাহিত্যের খাতাকে বোঝানো হয়েছে।

পাণ্ডুলিপি দুধরনের হতে পারে।—

ক. **লোক সাহিত্যের পাণ্ডুলিপি**

খ. **অভিজাত সাহিত্যের পাণ্ডুলিপি**

গ্রামাঞ্চলে অনেকে তাঁদের সাহিত্য (লোক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত) খাতায় লিখে রাখেন। আবার অনেকে মৌখিক সাহিত্যগুলি নিজের খেয়ালে সংগ্রহ করে খাতায় লিখে রেখেছেন। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে লোক সাহিত্যের দুধরনের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যেতে পারে, সেগুলির একটি শ্রেণীর—মৌখিক সাহিত্য সংগ্রহ।

অভিজাত সাহিত্যের পাণ্ডুলিপির মধ্যে গ্রন্থকারের দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুজল মিশে থাকে। যে কারণেই হোক সেগুলি মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করে নি। কিছুদিন তা ঘরে সংরক্ষিত থাকে। নতুন প্রজন্মে তা হয়ে পড়ে আবর্জনা। নতুন প্রজন্মের প্রকাশকের কাছে তা হয় অবাণিজ্যিক। সুতরাং সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়। লেখকরা চলে যান বিস্মৃতির গর্ভে। এই জাতীয় গ্রন্থগুলির সংগ্রহশালা গড়ে তোলা উচিত এবং বিজ্ঞাপনের সাহায্যে বিভিন্ন বাড়ী থেকে 'জঞ্জাল'গুলি সংগ্রহ করতে হবে।

এদেশে বিখ্যাত লেখকের অপ্রকাশিত রচনা উদ্ধারের যতখানি

উৎসাহ গবেষকদের মধ্যে দেখা যায়, সে তুলনায় অখ্যাত লেখকের পাণ্ডুলিপি উদ্ধারের তেমন উৎসাহ নেই। এই সব পাণ্ডুলিপির মধ্যে উন্নত মানের সাহিত্যও লুকিয়ে থাকা সম্ভব।

এগুলির মধ্যে পাঠ বা পাঠান্তর নির্ণয়ের সমস্যা নেই। আধুনিক বলে রচনাকালও অনেকগুলির পাওয়া যায়। তাই পুঁথিগবেষণার চেয়ে এগুলির গবেষণার প্রকৃতি অন্য ধরনের। বরং বলা যেতে পারে, এক গ্রন্থ সংগ্রহ ছাড়া অন্য যা-কিছু সবই মুদ্রিত গ্রন্থ গবেষণারই মতো। তবে গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সংশ্লিষ্ট তথ্য, সংরক্ষণকারী পরিবার বা অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে সংগ্রহ করবার একটা অবকাশ এক্ষেত্রে আছে।

প্রাঙ্‌মুদ্রণ যুগের যাবতীয় সাহিত্যকে দুভাগে ভাগ করা যায়।—

ক. মৌখিক সাহিত্য

খ. পুঁথির সাহিত্য

মৌখিক সাহিত্যের কোনো পুঁথি থাকে না। অবশ্য পুঁথি-ভিত্তিক সাহিত্য মৌখিক ভাবেও প্রচারিত হয়ে থাকে।

পুঁথিকে কেন্দ্র করে দুই ধরনের গবেষণা সাধারণতঃ হয়ে থাকে।—

ক. পুঁথিকে কেন্দ্র করে গবেষণা

খ. অন্য গবেষণায় তথ্য হিসেবে পুঁথি গ্রহণ

পুঁথি-সংশ্লিষ্ট গবেষণাকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :—

১. পুঁথি অনুসন্ধান বা পুঁথি সংগ্রহ

২. পুঁথির পাঠ নির্ণয়

৩. পুঁথির প্রাচীনত্ব, কাল বা গুরুত্ব-বিচার

৪. বিভিন্ন পুঁথির মাধ্যমে মূল গ্রন্থটি ও গ্রন্থকার সম্পর্কে আলোকপাত।

৫. পুঁথি সংশ্লিষ্ট নতুন তথ্য বা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা, মূল গ্রন্থের মূল্যায়ন লেখকের প্রতিভা ইত্যাদি।

পুঁথিভিত্তিক সাহিত্য গবেষকদের করণীয় কিছু দিক্ আছে। পুঁথি-গবেষকদের এগুলি জানা দরকার।—

ক. পুঁথিপাঠের ও পুঁথি ব্যবহারের জ্ঞান পুঁথি গবেষকদের প্রাথমিক ও আবশ্যিক অর্জনীয়।

খ. পুঁথি সম্পাদনা সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণাগ্রন্থ পাঠ করে উপস্থাপনরীতি সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করতে হবে।

গ. একই গ্রন্থের বিভিন্ন পুঁথি অথবা একই বিষয়ের বিভিন্ন পুঁথি সম্ভাব্য স্থান থেকে পড়তে, নোট করতে বা কপি করতে হবে।

ঘ. কাগজের সাধারণ পৃষ্ঠায় মূল পঙ্‌ক্তি রেখে এক বা একাধিক স্লিপে এক বা একাধিক পাঠান্তর একই স্থানে গ্রথিত করতে হবে। পৃষ্ঠার শেষে মন্তব্যের কিছু স্থান রাখতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে গবেষকের ইচ্ছিত অংশ বজায় রেখে অংশগুলি গৌণ হিসেবে পাশে রাখবার জন্য ফাইনাল অংশটাই শুধু লাল কালিতে আণ্ডারলাইন করতে হবে।

কোনো অংশ হুবহু অনুরূপ হলে গৌণ অংশে তা বন্ধনীযুক্ত থাকবে।

কোনো শব্দে বা শব্দগুচ্ছে টীকার ব্যাপার থাকলে কিংবা তাকে কেন্দ্র করে গবেষকের কোনো চিন্তা উদ্রিক্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ বিশেষ শব্দকে বা শব্দগুচ্ছকে তারকা-চিহ্নিত করে তার পাশে পেন্সিলে খুব ছোটো হরফে সে ব্যাপারে নোট রাখতে হয়। সব পুঁথি এক সঙ্গে এক জায়গায় থাকে না। তাই প্রথম পুঁথি কপি করতে হয়, এবং অন্যান্য পুঁথি পড়বার সময় স্লিপ দিয়ে কাজ সারতে হয়।

মূল পুঁথি তৈরী হয়ে যাবার সময় পুঁথির প্রামাণিকতা বিচার থাকে। আকর্ষণীয় অংশ হলেই যে তা মূল গ্রন্থকারের হবে, এমন কোনো কথা নেই। তবে অসম্পূর্ণ অংশ সম্পূর্ণ করতে যদি কোনো অপ্রামাণ্য পুঁথির অংশ যুক্ত করতে হয়, তাহলে তা নোট রাখতে হবে।

এর পর এই পুঁথিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গ্রন্থপাঠ, সন্ধান,

যোগাযোগ, তথ্য আহরণ, চিন্তাভাবনা এবং লেখা অন্যান্য গবেষণা পদ্ধতির মতোই করে যেতে হবে।

মুদ্রিত গ্রন্থাদি ও বিমিশ্র উপাদান : এগুলি সম্পর্কে গবেষণার বিষয়ে সাধারণ সাহিত্য গবেষণার পদক্ষেপ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা রাখা হলো। তাই এ বিষয়ে এই অধ্যায়ে পৃথকভাবে কোনো কিছু লেখা বাহুল্যবোধে তা পরিত্যক্ত হলো।

---

৭. সাধারণ সাহিত্য-গবেষণার পদক্ষেপ

সাধারণ সাহিত্য-গবেষণা বিচিত্র বিষয় নিয়ে হতে পারে। সাহিত্যিক ও সাহিত্যকে একক বা সামষ্টিকভাবে আলোচনা, একক ও সামষ্টিকভাবে তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ, সাহিত্যিক ও সাহিত্যের সঙ্গে পাঠক, অঞ্চল, যুগ ইত্যাদি বিষয়ের সম্পর্ক—ইত্যাদি বহু বিষয়ই সাহিত্য-গবেষণার অন্তর্গত হতে পারে। এমন কি সাহিত্য তত্ত্বও সাহিত্য-গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে। মুদ্রিত সাহিত্যের আবিষ্কার ছাড়াও সাধারণ সাহিত্য-গবেষণায় পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের ও তথ্যের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন থাকে। আবার নিজস্ব তত্ত্বের যুক্তি বা নিজস্ব তথ্যের উৎস ও প্রামাণিকতা সম্পর্কে বক্তব্যও থাকে।

সাধারণ সাহিত্য-গবেষণায় কতকগুলি পদক্ষেপ আছে. এই পদক্ষেপের ক্রম সম্পর্কে কিছুটা ধারণা না থাকলে এলোমেলোভাবে অগ্রসর হয়ে বেশ কিছুটা সময় আমরা নষ্ট করে ফেলি। তবে কোনো কিছুই ফেলা যায় না। অনেক সময় গবেষণার প্রডাক্ট-এর চেয়ে বাই-প্রডাক্টই বেশি তৈরী হয়ে যায়। এগুলো পরে কাজে এসে যায় বিবিধ গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে। কারণ একটা গবেষণা শেষ হলে পরিকল্পনা গ্রহণ বা উপকরণ সংগ্রহের বিষয়ে কাজগুলি অনেকটা সহজসাধ্য হয়ে যায়। এ তো গেলো এলোমেলো পদক্ষেপের দিক। কিন্তু এর কুফলটা নিতান্ত কম মর্মান্তিক নয়। অনেককেই এইভাবে এগোতে গিয়ে রণে ভঙ্গ দিতে দেখা গেছে। কিন্তু নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী পদক্ষেপ করলে তাঁদের দ্বারাই ভালো একটি গবেষণার কাজ সম্পন্ন হতে পারতো।

১. **মানসিকতা গঠন :** গবেষকের জন্য গবেষণা, না—গবেষণার জন্য গবেষক—এই প্রশ্নের পরিচ্ছন্ন উত্তর কেউই দেবেন না। আধুনিক গবেষকদের প্রবণতা দেখে, মনে হয় যে, গবেষকের জন্যই গবেষণা। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি ও চাকরির ক্ষেত্রে সুযোগ দান ও গ্রহণ—

ইত্যাদি বস্তুর প্রমাণ দিয়ে অনেকেই বলবেন যে গবেষকের জন্যই গবেষণা। অপ্রিয় হলেও একথা পরিষ্কার যে তাঁরা স্বার্থপর। যদি তাঁরা বলেন,—কে স্বার্থপর নয়! তাহলে তাঁদের সঙ্গে তর্ক করা চলে না। তাই মানসিকতা গঠন সম্পর্কে যে পদক্ষেপের কথা এখানে বলা হয়েছে, তা তাঁদের কাছে মূল্যহীন। তাঁদের কাছে মার্জনা চেয়ে মুষ্টিমেয় কিছু আদর্শবাদী গবেষকের জন্য এই পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হলো। এ বিষয়ে 'গবেষক : সাহিত্য গবেষক' অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

২. **জ্ঞানের সামগ্রিক ভিত্তি নির্মাণ :** এই পদক্ষেপে গবেষকের নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রধানভাবে করণীয়।—

ক. **তালিকা প্রণয়ন**

খ. **তালিকা অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে নোট**

গ. **বিভিন্ন সন্ধান- সংবাদের জন্য অন্য একটি খাতার ব্যবহার**

এ যাবৎ অ্যাকাডেমিক বা অ্যাকাডেমি বহিভূর্ত ক্ষেত্রে গবেষক সাহিত্য ও আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কিত কী জ্ঞান কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কত গভীর বা কত ব্যাপক ভাবে অর্জন করেছেন, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবেন। যে যে ক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞানাভাব বা জ্ঞান সীমিত, অগভীর বা সঙ্কীর্ণ, সে সব ক্ষেত্রে গবেষককে কিছু কিছু পড়াশোনা করতে হবে। বলা বাহুল্য এই পড়াশোনা একটা নির্দিষ্ট মান পর্যন্তই থাকবে। পুরোনো বা নতুন বিভিন্ন বই।ও পত্র-পত্রিকার খবর এই সময় থেকেই গবেষক রাখতে শুরু করবেন। আনুষঙ্গিক অন্যান্য খবর নেবার চেষ্টাও এই সময় থেকেই শুরু করা যেতে পারে।

৩. **মনোযোগের কেন্দ্র নির্ধারণ :** পূর্বোক্ত করণীয় বিষয়গুলির মধ্য দিয়েই এই পদক্ষেপ। তাই বিভিন্ন বিষয় পড়তে পড়তে স্বাভাবিকভাবেই একটি দিকে গবেষকের আকর্ষণ জন্মাবে। তখন সে বিষয়ে একটু বেশি পড়াশোনার জন্য দরকার—

ক. **বিশেষ গ্রন্থ তালিকা প্রণয়ন**

খ. উক্ত তালিকা অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে পৃথক খাতায় নোট

গ. বিশেষ বিষয়ের বা বিষয় সংক্রান্ত পত্রপত্রিকা পাঠ ও নোট

ঘ. বিভিন্ন সন্ধানমূলক যথারীতি একটি খাতার ব্যবহার : যখন একটি বিশেষ দিকে আকর্ষণ আসবে, তখন আপনা থেকেই সে সম্পর্কে একটু বেশি জানতে, একটু বেশি ভাবতে ইচ্ছা করবে। এবার গবেষক বোধ করবেন যে, এ সম্পর্কে নতুন কিছু তিনি বলতে পারবেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে গবেষক লাভবান হতে পারেন।

৪. **শিরোনাম নির্ধারণ :** চিন্তাভাবনাকে আরো কেন্দ্রীভূত করতে হলে শিরোনাম নির্ধারণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শিরোনাম নির্ধারণের জন্য নিম্নোক্ত দিকগুলি করণীয়।—

ক. বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী গবেষণার শিরোনাম পর্যবেক্ষণের জন্য সম্পন্ন গবেষণাগুলির তালিকা পাঠ।

খ. চলমান বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী গবেষণার শিরোনাম পর্যবেক্ষণ।

গ. সম্ভাব্য তত্ত্বাবধায়ক বা অন্য অভিজ্ঞ এক বা একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা।

এই সময়ে বিশেষ বিষয়-কেন্দ্রিক পড়াশোনা যথারীতি পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে চালিয়ে যেতে হবে এবং শিরোনাম নির্দিষ্ট হলে এই শিরোনামকে কেন্দ্র করে চিন্তাভাবনাও করতে হবে। এই সময় পড়াশোনা ছাড়া চিন্তাভাবনার জন্যও নিজস্ব অবকাশ থাকবে।

৫. **গবেষণার প্রকৃতি নিরূপণ :** গবেষণা ঠিক কোন্ প্রকৃতির মধ্যে পড়ে, সেটা বুঝে নিতে হবে। গ্রামীণ সাহিত্য অথবা নগর-কেন্দ্রিক সাহিত্য-গবেষণার প্রকৃতি ভিন্ন। গ্রামীণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে পুঁথিসংগ্রহ, মৌখিক সাহিত্য সংগ্রহ, সংগৃহীত মৌখিক সাহিত্যের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার ইত্যাদির জন্য ইতিমধ্যে আলোচিত পদ্ধতিগুলি প্রয়োজনমতো গ্রহণ করা উচিত। তবে গ্রামীণ সাহিত্য সম্পর্কে

গবেষণার ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগার ও সংগ্রহ ব্যবহারেরও অবকাশ আছে। বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল ঘোরার জন্য সর্ববিধ প্রস্তুতি, ব্যবহার্য বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কাছে রাখা—ঐ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। নগর কেন্দ্রিক সাহিত্যে গ্রামীণ সাহিত্যের মতো ফিল্ড ওয়ার্ক আছে—বিশেষ করে মৌখিক সাহিত্য গবেষণা, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ইত্যাদির ক্ষেত্রে। এসব ক্ষেত্রেও গ্রন্থাগার ব্যবহার নিয়মিত ভাবেই চালিয়ে যেতে হয়। এ ছাড়া অন্য যা-কিছু গবেষণা—সবই গ্রন্থাগার-নির্ভর। তবে বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত কাগজ-পত্র পাঠের সুযোগ গ্রহণ এবং তার জন্য উপযুক্ত স্থানগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার হয়। প্রকৃতি নির্ধারিত হলে নিম্নোক্ত কাজগুলি সাধারণ সাহিত্য গবেষকের করণীয় :—

ক. গবেষণার প্রকৃতি অনুসারী বিশেষ গ্রন্থতালিকা প্রণয়ন।

খ. গবেষণার পক্ষে প্রয়োজনীয় সন তারিখ উল্লেখ সহ সাময়িক পত্রিকার তালিকা প্রণয়ন।

গ. আনুষঙ্গিক অন্যান্য গ্রন্থতালিকা প্রণয়ন।

ঘ. সম্ভাব্য অন্যান্য উৎসের তালিকা প্রণয়ন।

ঙ. তালিকার সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ-প্রাপ্তির স্থানগুলিও উল্লেখ করতে হবে অন্যান্য ইঙ্গিত সহ।

চ. নতুন নোটখাতা থাকবে এবং পুরোনো নোটখাতা থেকে আহৃত তথ্য যাচাই করতে হবে এবং আণ্ডারলাইন করতে হবে।

ছ. নতুন একটি সন্ধান খাতা থাকবে এবং পুরোনো সন্ধান খাতা থেকে প্রয়োজনীয় সন্ধানগুলি আণ্ডার লাইন করতে হবে।

এই সময়ে গবেষকের বিষয়কেন্দ্রিক ভাবনা-চিন্তা অব্যাহত থাকবে।

৬. **পরিকল্পনা গ্রহণ :** গবেষণার জন্য এই পদক্ষেপে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। এ যাবৎ কৃত পড়াশোনা, চিন্তা-ভাবনা ও অন্যান্য কাজের মধ্য দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণের যোগ্যতা

তেমন ভাবেই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে গবেষকদের করণীয় কিছু কাজ আছে।—

ক. পরামর্শ গ্রহণ

খ. প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সমধর্মী গবেষণাগ্রন্থের পরিকল্পনা পর্যালোচনা।

গ. সমধর্মী চলমান গবেষণার উদার গবেষকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা।

ঘ. একাধিক বৈকল্পিক পরিকল্পিত অধ্যায় নির্মাণ।

ঙ. প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য সংগ্রহণীয় তথ্যের ইঙ্গিত।

চ. ফাইল ও খাম এক একটি অধ্যায়ের ভিত্তিতে প্রস্তুত রাখা।

ছ. চিন্তা-ভাবনার প্রচুর সময় রাখা।

জ. সন্ধানখাতা ও ডায়ারি কাছে রাখা।

ঝ. স্লিপ প্রস্তুত রাখা।

ঞ. এখন থেকে লুজ ফুল্‌সক্যাপ কাগজ ব্যবহার করা।

ট. এলেমেলো চিন্তাভাবনার জন্য একটি সাধারণ মোটা খাতা রাখা।

সন্ধানখাতা, ডায়ারি, স্লিপ ও ফাইলসহ লুজ কাগজ (পৃথক টেঁকসই একটি কভার ফাইল) ছাড়া অন্য যা-কিছু সব বাড়ীতেই থাকবে। পূর্বোক্ত জিনিসগুলি একটু ব্যাখ্যা করে বোঝানো দরকার।

পরামর্শ গ্রহণের প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে, প্রবন্ধ-রচনা ও গ্রন্থ রচনার মধ্যে পার্থক্য আছে। তাই একটি পরিকল্পনাকে সাজাতে হলে অভিজ্ঞ দুই একজনের কাছে কিছু মৌখিক পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এরপর কী ভাবে অধ্যায় বিভাগ করা যায়, সে সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা আসবে।

প্রকাশিত—বিশেষতঃ সমধর্মী গবেষণা-গ্রন্থগুলির অধ্যায় পরিকল্পনাগুলি দেখে নিতে হয়। বেশ কিছু গবেষণা গ্রন্থের সূচী স্টাডি করলে নিজস্ব গবেষণা গ্রন্থের অধ্যায় বিভাগ সম্পর্কে পূর্বের ধারণা আরও স্পষ্ট হবে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থায় অপ্রকাশিত Typed গবেষণা গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে সেগুলির পাতাও ওল্টানো যেতে পারে—যদি তা সমধর্মী গবেষণা হয়।

গবেষণার কাজে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্থা ও পাঠাগারে আরো অনেক গবেষক যাতায়াত করে থাকেন। প্রত্যেকেই তাঁদের নিজের বৃত্তে ঘোরেন, তাই এঁরা একটু উদার ও সহৃদয় হয়ে থাকেন। নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বও গড়ে ওঠে। ভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণারত কোনো গবেষক তথ্য ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে অন্যের উপকারে লাগতে পারে এসব তথ্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে জানিয়ে দেন, অনেক সন্ধানও দিয়ে থাকেন। সুতরাং অধ্যায় সাজানো সম্পর্কে এঁদের মধ্যে অনেকেই সহায়তা করতে পারেন, তবে যা কিছু করার—তা নিজের বিবেচনাতেই করতে হবে। পরনির্ভরতা কাটিয়ে তুলতে হবে।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবনার প্রভাবে বিভিন্ন ধরনের অধ্যায় পরিকল্পনা মনে আসতে পারে। প্রতি পরিকল্পনাই পৃথক পৃথক ভাবে লিখতে হবে। তারপর এগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করতে করতে ফাইনাল অধ্যায় পরিকল্পনা ঠিক করে নেওয়া সম্ভব হবে।

এরপর অধ্যায়ভিত্তিক ভাবে এক একটি পৃষ্ঠা পৃথক করতে হবে। এই পৃষ্ঠাগুলিতে অধ্যায়ের জন্য সংগ্রহণীয় তথ্যের ইঙ্গিত থাকবে। ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ নোটখাতা ও ডায়ারিগুলির সংখ্যাচিহ্ন থাকবে। অধ্যায়ের জন্য আহৃত তথ্য প্রয়োজনীয় হলে খাতার সংখ্যা ও পৃষ্ঠার সংখ্যা অধ্যায়-পৃষ্ঠায় নোট করতে হবে।

এরপর এক একটি অধ্যায়ের জন্য এক একটি ফাইল ও বড়ো খাম করতে হবে। অধ্যায় পৃষ্ঠা ফাইলের প্রথমে থাকবে। প্রতি

ফাইলে থাকবে কিছু লুজ কাগজ। হঠাৎ আহৃত তথ্যগুলি স্লিপে খামের মধ্যে থাকবে। নিজস্ব বিচ্ছিন্ন চিন্তাভাবনাগুলি ভিন্ন কালিতে লিখে ফাইলে রাখতে হবে। বিভিন্ন চিন্তাভাবনার জন্য প্রচুর সময় রাখতে হবে। এজন্য নির্জনতা ও অভিনিবেশের দরকার হয়।

গবেষণার ফাইলের সঙ্গে অন্য খাতাগুলি যেন না মেশে। খাতাগুলি নম্বর অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা উচিত। যে খাতা সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, অর্থাৎ সন্ধানের খাতা, তার সংগৃহীত নোট বাড়ীতে ডুপ্লিকেট করে রাখা উচিত। হঠাৎ দুর্যোগ বা দুর্ঘটনায় সন্ধানের নোটখাতাটি হারিয়ে যেতে বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ভেবে নিয়েই এই সতর্কতা। এই সময় গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ সম্পর্কে বোধ আপনা থেকেই জন্মাবে। আলোচিত পদ্ধতিগুলো প্রয়োজন মতো গবেষক ব্যবহার করতেন পারেন।

৭. **পরিকল্পনার অন্তর্গত উপবিষয় ভিত্তিক পদক্ষেপ :** পূর্ববর্তী পদক্ষেপ শেষ হলে একটি করে অধ্যায়ের ফাইল নিয়ে কাজ করতে হবে। এবার থেকে মনে করতে হবে যে এক একটি অধ্যায়ই এক একটি গবেষণা। অন্য উপবিষয় সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা আপাততঃ মন থেকে সরিয়ে রাখতে হবে। অবশ্য অন্যান্য উপবিষয় বা অধ্যায় ভিত্তিক কোনো তথ্য বা অন্য কিছু অযাচিতভাবে এসে গেলে তা স্লিপে লিখে তার নিজস্ব ফাইল সংলগ্ন খামে ঢুকিয়ে রাখতে হবে। সময়াভাব থাকলে শুধু ইঙ্গিত ও রেফারেন্স উল্লেখ করতে হবে স্লিপে।

অধ্যায়ভিত্তিক ভাবে পড়াশোনা, তথ্যসংগ্রহ, চিন্তাভাবনা ইত্যাদির জন্য সারকরণ, তালিকাকরণ, সূচীকরণ, উদ্ধৃতিকরণ ইত্যাদি অতি সাধারণ পদ্ধতিগুলি কাজে লাগাতে হয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার অভিজ্ঞতা থাকায় নির্দিষ্ট অধ্যায় বা উপবিষয়ের জন্য কী জাতীয় চাহিদা, তা গবেষক অনুভব করতে পারবেন। চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থপাঠের ক্ষেত্রে চাহিদা বিন্যাসও দরকার। তাই

চাহিদা বিন্যাস অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট গ্রন্থের সুনির্দিষ্ট অংশগুলিই শুধু পাঠ করা দরকার। এগুলি মনকে যতোক্ষণ গতিশীল করে না তোলে, ততোক্ষণ এগুলি সম্পর্কে পড়াশোনা করতে হয়। প্রতিটি বই পড়বার পর সেই পঠিত বিষয়ের ভাবনাকে নিজস্ব ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করতে হবে।

. এবারে ফাইলের লুজ কাগজে অধ্যায়ের খসড়া করে ফেলা যেতে পারে। অধ্যায়ের খসড়ার মধ্যে এলোমেলো ভাবে কোনো কিছু লেখা হলে তাতে নির্দিষ্ট স্থানের ইঙ্গিত দেওয়া হবে। অর্থাৎ লেখায় যে চিহ্ন, নির্দিষ্ট স্থানে সেই চিহ্ন দিতে হবে। এই পর্বে উৎস ব্যবহার ও চিন্তাভাবনা—দুই কাজই একসঙ্গে চলবে।

৮. **ব্যাপক উৎস ব্যবহার ও চিন্তা-ভাবনা :** উপবিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে এবারে ব্যাপকভাবে গ্রন্থপাঠ করতে হয়, পত্র-পত্রিকা পাঠ করতে হয়, আনুষঙ্গিক ডকুমেণ্ট থেকে প্রয়োজন মতো নোট নিতে হয়। এটি পূর্ববর্তী পদক্ষেপেরই একটু ব্যাপক ও গভীর অনুসন্ধান। চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও গভীর অভিনিবেশ দরকার হয়। এই পর্বের জন্য বেশি সময় দেওয়া দরকার।

এই প্রসঙ্গে কিছু জ্ঞাতব্য জিনিস জানিয়ে রাখি। প্রয়োজন অপ্রয়োজনের দ্বিধার ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে মার্জিনে জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়ে তথ্য গ্রহণ করতে হয়। যে কোনো তথ্যের ক্ষেত্রে উৎসের উল্লেখ বাধ্যতামূলক। গ্রন্থের ক্ষেত্রে গ্রন্থের নাম, প্রকাশস্থান, গ্রন্থকার বা সম্পাদক, সংস্করণ, প্রকাশ তারিখ ও পৃষ্ঠা সংখ্যার উল্লেখ থাকবে। পত্রিকার ক্ষেত্রেও পত্রিকার প্রকাশ-স্থান, বর্ষ ও সংখ্যা, প্রকাশকাল, পৃষ্ঠা সংখ্যার উল্লেখ থাকবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে সন তারিখ উৎস স্থান ইত্যাদির উল্লেখ থাকবে। পরোক্ষভাবে গৃহীত হলেও উৎসস্থানের উল্লেখ থাকবে। গবেষণায় ক্যাসেট থাকলে গ্রন্থের বিশেষ স্থানে ক্যাসেটের নাম্বার উল্লেখ করে গ্রন্থের সঙ্গে সেই ক্যাসেট পৃথক বাক্সে সংরক্ষিত রাখতে হয়। অন্যান্য দেশে কাগজের মতো পাতলা নরম ডিস্ক আছে। ক্যাসেট থেকে ডিস্কে রূপান্তরিত

করে বইয়ের শেষে থামে সেগুলি নম্বরসহ রক্ষিত থাকে। আমাদের সাহিত্য-গবেষণা এই সামান্য পর্যায়েও এখনো আসে নি। তবু জেনে রাখা ভালো।

প্রতিটি উপবিষয় নিয়ে পূর্বোক্তভাবে পৃথক পৃথক ভাবেই পদক্ষেপ নিতে হবে। তথ্য ও চিন্তাভাবনার দিক থেকে যখন উপবিষয়গুলির ফাইল ও খাম মোটামুটি সন্তোষজনক হয়, তখন সেই উপবিষয়ের প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে, ভেবে নিতে হবে।

৯. **তথ্য ও ভাবনার বিন্যাস :** এবারে উপবিষয় বা অধ্যায় সম্পর্কিত প্রতিটি ফাইলে দেখা যাবে নিম্নোক্ত উপাদানগুলিই প্রধানতঃ আছে।—

ক. **কিছু গ্রন্থোদ্ধৃত বক্তব্যের সারকরণ**
খ. **কিছু গ্রন্থের উদ্ধৃতি**
গ. **অন্যান্য তথ্য**
ঘ. **কিছু বিক্ষিপ্ত নিজস্ব চিন্তাভাবনা**

যে উদ্দেশ্য নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বিক্ষিপ্ত চিন্তাভাবনাগুলির বিন্যাসের কথা ভাবতে হবে। প্রাপ্ত উপাদানগুলি শর্টিং করে ফেলে এক একটি ভাবনাকে সেই উপাদানগুচ্ছের সঙ্গে মিলিয়ে এক একটি পৃষ্ঠায় তাকে নিজস্ব ভাবনার মেরুদণ্ডে রূপ দিতে হবে। তারপর পৃষ্ঠাগুলি বিন্যাস করলেই একটা অধ্যায়ের একটা চেহারা ফুটে উঠবে। এইভাবে এক একটি অধ্যায় ধরে ধরে কতকগুলি পৃষ্ঠার সমবায়ে এক একটি অধ্যায়ের চেহারা ফুটিয়ে তুলতে হবে।

১০. **প্রাথমিক লিখন :** এই পদক্ষেপে গবেষক বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করে এক একটি অধ্যায় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আকারে লিখে ফেলবেন। লিখতে লিখতে কোনো স্থানে পরিবর্তনীয়, তথ্যাভাব বা অন্য কোনো দুর্বলতার প্রশ্ন থাকলে সেখানে তা অন্য কালিতে চিহ্নিত করতে হবে। এই বিষয় নিয়ে তথ্য সংগ্রহ বা চিন্তাভাবনা করে অধ্যায়গুলির মধ্যে পূর্ণতা নিয়ে আসতে হবে।

১১. **সংযুক্তিকরণ :** এবারে সব অধ্যায় একটি গ্রন্থের আকারে সংযুক্ত করতে হবে এবং বার বার পড়তে হবে। চিন্তা করতে হবে যে, এটি একটি অখণ্ড গ্রন্থ। বার বার পড়তে পড়তে কতকগুলি করণীয় দিক সম্পন্ন করতে হবে—

ক. **সামগ্রিক রূপ স্মরণ করে অধ্যায়গুলি পর্যবেক্ষণ**

খ. **অধ্যায়ে অনুপাত স্থিরীকরণ**

গ. **অপূর্ণতা বিচার**

ঘ. **পূর্ণতা সাধন প্রচেষ্টা**

এই সংযুক্তিকরণের সঙ্গে সঙ্গে উপসংহার লিখে ফেলতে হবে। উপসংহার সামগ্রিক চেতনার ভিত্তিতে রচিত হয়। ভূমিকা অংশ অবশ্য পূর্বে লেখা হলেও তাতে সামগ্রিক চেতনার ভিত্তিতে একটু ঘষামাজা করে নেওয়া যেতে পারে।

যতো সহজে অসঙ্গতি বা অপূর্ণতা ধরা পড়ে, ঠিক ততো সহজে তাতে সঙ্গতি বা পূর্ণতা এনে দেওয়া যায় না। এসব ক্ষেত্রে গবেষক খুব অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে পড়েন। তত্ত্বাবধায়ক এসব ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারেন। যেসব ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক স্বয়ং অসহায়, সেক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কভাবে থিসিসের খণ্ডাংশ সহ অন্য কোনো বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে কিংবা পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে। কোনো মতেই থিসিসের খণ্ডাংশ হস্তান্তরিত করা চলবে না। পাণ্ডুলিপি একমাত্র তত্ত্বাবধায়ককেই সাময়িকভাবে হস্তান্তরিত করা যেতে পারে—অবশ্য কপি রেখে। যে ক্ষেত্রে গবেষক বাধ্য হয়ে অন্য ব্যক্তির কাছে যান, সেক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়কের মনে আদৌ ঈর্ষা হওয়া উচিত নয়। কারণ তাঁর মনে রাখা উচিত যে তিনি সর্বজ্ঞ নন। বরং তাঁর উচিত গবেষকের সঙ্গে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়া। তবু তত্ত্বাবধায়কের চারিত্রিক দুর্বলতার ক্ষেত্রে মানব স্বার্থে গ্রন্থকার এটুকুই বলতে পারেন যে, এক্ষেত্রে গবেষক ছলনার আশ্রয় নিলে পাপ নেই। কারণ আগে গবেষণা, পরে গবেষক ও তত্ত্বধায়ক।

১২. **চূড়ান্ত লিখন :** এই পদক্ষেপ অত্যন্ত ধীর স্থির ভাবে নিতে হয়। লিখতে গিয়ে যেখানে খটকা লাগে, সেখানে লেখা থামিয়ে দেওয়া ভালো। সে বিষয়ে আরো খোঁজখবর নিয়ে এগোনো উচিত। ভাষা গবেষণার মাধ্যম। তাই গবেষণা গ্রন্থের প্রতিটি শব্দ প্রয়োগে অত্যন্ত সচেতন হওয়া দরকার। যেহেতু চূড়ান্ত পরীক্ষাগুলি পাশের ক্ষেত্রে ভুল বানান সম্পর্কে পরীক্ষার্থীকে স্মরণ করিয়ে দেবার কোনো ব্যবস্থা নেই, তাই ভুল বানান সহ অনেক ছাত্রই উচ্চতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গবেষণার অধিকারী হতে পারেন। বলা বাহুল্য বানান ভুল গবেষক সম্পর্কে ধারণা খারাপ করে দেয়। যাঁরা সম্পূর্ণ শুদ্ধ বানান লিখতে জানেন না, তাঁরা গবেষণার কাজ করবেন না— এ কথা আমরা বলতে পারি না। তবে ভাষায় যথার্থ শিক্ষিত একজনকে দিয়ে বানান দেখিয়ে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য যিনি সাহিত্যে উচ্চতর ডিগ্রী বা সম্মান নিতে চলেছেন, তিনি শুদ্ধ বানান লিখতে জানেন না, এটা শুনতে খুব কষ্ট হয়। উদ্ধৃতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যাঁর উদ্ধৃতি, তাঁর প্রদত্ত নিজস্ব বানানসহ উদ্ধৃতি দেওয়াই রীতিসম্মত—এমন কি অশুদ্ধ হলেও। দুর্বোধ্য শব্দ প্রযুক্ত হলে কিংবা হাস্যকর বা ভুল প্রয়োগ থাকলে তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য স্মরণ করে যথাযথ ইঙ্গিত পাশাপাশি দেওয়া চলবে। ইংরেজি বা দেবনাগরী হরফ বাংলা গবেষণা গ্রন্থে উদ্ধৃতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্য ভাষার উদ্ধৃতি দিতে হলে তা বাংলা উচ্চারণে দেওয়া ভালো। অন্য ভাষার উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব হলে অনুবাদ দেওয়া ভালো—অন্ততঃ যেখানে ভাষার বাধা পাঠক উপলব্ধি করতে পারেন।

চূড়ান্ত লেখা শেষ হলো। যা গবেষণার অনুষঙ্গ এমন কিছু জিনিস পরিশিষ্টে দেওয়া যেতে পারে। পরিশিষ্ট গবেষকের কোনো রচনা নাও হতে পারে। যেক্ষেত্রে গবেষকের নিজস্ব কলম থাকে সেখানে সেই অংশও দেখে নিতে হবে। তথ্য দিতে হলে তা যেন সব দিক থেকে যথাযথ থাকে। উৎস নির্দেশেও যেন থাকে। আনুষঙ্গিক জিনিস ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে গ্রন্থ ভারী করা অনুচিত।

ফুটনোটে অনেকে উৎস নির্দেশ করেন। অনেকে গ্রন্থশেষে তা দিয়ে থাকেন। এখানে গ্রন্থকারের স্বাধীনতা আছে। অনেকে পঠিত গ্রন্থপঞ্জীও দিয়ে থাকেন। কিন্তু অকারণ অপঠিত গ্রন্থের নাম দিয়ে পাণ্ডিত্য জাহির করা দুর্নীতি। তাই গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নে সততা বাঞ্ছনীয়। গবেষণার কাজে কিছু কিছু অনাবিষ্কৃত তথ্য উদ্ঘাটিত হয়। তা যদি পরিশিষ্টে দেওয়া নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক না হয় দেওয়া যেতে পারে।

লিখন-পদ্ধতির ক্ষেত্রে কাঠামোগত চারটি দিক আছে। এই দিকগুলি, যথা—

ক. পরিধি নির্দেশ ও পৃষ্ঠভূমি রচনা

খ. কেন্দ্রানুগমন

গ. কেন্দ্র-সজ্জা

ঘ. কেন্দ্রাতিগমন

ঙ পরিধি সন্নিহিত চিন্তাভাবনা

প্রতিটি বিষয়ের শিরোনাম পর্যবেক্ষণ করলে তার বক্তব্যের বিষয় সম্পর্কে যেমন একটা ধারণা আসবে, ঠিক তেমনি তার পরিধি সম্পর্কে ও Level সম্পর্কেও একটা ধারণা আসবে। এই দুটি দিক সম্পর্কে যে চেতনা, তাকে চিন্তাসূত্রের মূল বন্ধন হিসেবে গ্রহণ করে চিন্তা-সূত্রকে কেন্দ্রের পথে নিয়ে যেতে হয়। একে কেন্দ্রানুগমন বলা যায়।

কেন্দ্র সজ্জা বলতে বুঝি, মূল বক্তব্যকে পারম্পর্য রক্ষা করে বিন্যাস করা। বিন্যাস শেষে আবার পরিধির কাছে বা লেভেলের কাছে ফিরে আসতে হয়। তবে এই ফিরে আসার গতি দ্রুততর। এবং শেষে পরিধি নির্দেশের বদলে থাকে পরিধি সন্নিহিত চিন্তাভাবনা। পরিধি নির্দেশ ও পৃষ্ঠভূমি রচনা হচ্ছে ভূমিকা অংশ এবং কেন্দ্রাতিগমন হচ্ছে উপসংহার। পরিধি সন্নিহিত চিন্তাভাবনাকে সাধারণতঃ পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এবারে গবেষণার কাজ শেষ হলো। এখানে পদ্ধতি আলোচনায় একটি জিনিস হয়তো পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে যে,

তত্ত্বাবধায়ককে যতোটা সম্ভব আড়ালে রাখা হয়েছে। এটা সচেতন ভাবেই করা হয়েছে—গবেষককে স্বয়ংনির্ভর করবার জন্যই। অ্যাকাডেমিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে পরনির্ভরতার যে ভূত ঘাড়ে চেপে আছে, তা নামাবার উদ্দেশ্যেই এই প্রচেষ্টা। তাছাড়া স্বাধীন গবেষকও অনেক রয়েছেন। তবু তত্ত্বাবধায়করা গবেষকদের যথাসাধ্য সহায়তা করবেন।

---

৮. অনুপর্ব

অনুপর্ব বলতে বোঝানো হয়েছে অ্যাকাডেমিক থিসিস লেখা সম্পূর্ণ হওয়ার পরবর্তী কাজগুলির প্রসঙ্গ। যাঁরা কোনো প্রত্যাশার বশবর্তী না হয়ে স্বাধীনভাবে গবেষণা করে থাকেন, তাঁদের উচিত গ্রন্থ আকারে তা মুদ্রণের ব্যবস্থা করা। অবাণিজ্যিক—এই ধারণা নিয়ে বই ছাপতে প্রকাশক অসম্মত হলে নিজের উদ্যোগেই ব্যবস্থা নিতে হবে। নইলে ধারাবাহিক ভাবে গবেষণা-পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করা উচিত। পাণ্ডুলিপি আকারে হস্তান্তর হওয়া বিপজ্জনক।

যেক্ষেত্রে অ্যাওয়ার্ডের জন্য থিসিস প্রস্তুত করা হয়, সেক্ষেত্রে মুদ্রিত আকারে বা Typed copy হিসেবে সংস্থা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিতে হয়—তাদের যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে এবং তত্ত্বাবধায়কের সম্মতি সাপেক্ষে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাধীন গবেষণায় সংস্থা বা বিশ্বিবদ্যালয়ের নিয়ম অনুসরণ করেই জমা দিতে হয়, তবে মুদ্রিত কপির চেয়ে Typed copy জমা দেওয়াই ভালো এই কারণে যে পরীক্ষক চিহ্নিত দুর্বল অংশগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে সংশোধন করা সম্ভব হয়—যা মুদ্রিত গ্রন্থের ক্ষেত্রে হয় না। সাধারণ ভাবে এই পর্বে গবেষকের করণীয় দিকগুলি ক্রমান্বয়ে বিবৃত করা হলো।

১. **কপির প্রস্তুতি :** সম্পন্ন থিসিসটির পাণ্ডুলিপি অংশ টাইপিস্টের জন্য পরিষ্কার করে কপি করতে হয়। লেখা ঠিক যেভাবে থাকা উচিত, সে ভাবেই লিখতে হবে। টাইপে Bold Type নেই। তাই আণ্ডারলাইন করে Bold Type-এর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হবে। Typed copyতে হাতেও আণ্ডারলাইন করা যায়—নীল অথবা কালো কালিতে। তবে কোনোমতেই লাল কালির ব্যবহার এতে থাকবে না। এইভাবে Type-এর জন্য থিসিসের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হবে।

২. **টাইপিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ :** বাংলা সাহিত্যের থিসিস প্রায় সবই বাংলায় লেখা হয়। ইংরেজি টাইপের ক্ষেত্রে কোনো

সমস্যা নেই। তবে বাংলা ভাষার পাণ্ডুলিপিতে ইংরেজি বা দেবনাগরী হরফ আংশিকভাবে থাকতে পারে। বাংলা টাইপিস্ট সে স্থানে Space রাখবেন এবং গবেষক পরবর্তীকালে যথাস্থানে সেই অংশগুলি Typed করিয়ে নেবেন। তাই প্রথমেই বাংলা টাইপিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত।

বাংলা টাইপিস্ট বহুস্থানেই দেখা যায়। কিন্তু অনেকেরই শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন ঘাটতি আছে, তেমনি যুক্তাক্ষরের স্বরূপ জ্ঞানও কম। ঙ্গ, হ্ম, ঞ্জ, জ্ঞ—ইত্যাদি যুক্তাক্ষর প্রাচীন রীতিতে অনুরূপ ভাবে তাঁরা ছাপ্‌তে পারেন কিনা, কিংবা আধুনিক রীতিতে বিভ্রান্তিমূলক ভাবে ছাপেন কিনা—অর্থাৎ হ্ম-কে হ্‌ম না ছেপে ম্‌ভ ছাপেন কিনা—এসব বিষয়ে তাঁকে একটু বাজিয়ে নেওয়ার দরকার আছে।

যাঁরা কিছু কিছু থিসিস টাইপ করেছেন, তাঁরা এমন কি অর্ধশিক্ষিত হলেও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাঁরা মারাত্মক কিছু ভুল করবেন না। টাইপের জন্য প্রস্তুত খুব পাতলা অথচ টেঁকসই কাগজ ও কার্বন নিজে কিনে দেওয়া চলে অথবা টাইপিস্ট নিজেই কিনে নেবেন। মোটকথা টাইপিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তিনি বিশ্বস্ত কিনা, সেটা বিচার করা কঠিন হলেও অন্য সূত্র থেকে জেনে নেওয়া ভালো। টাইপিস্টের বাড়ীর ঠিকানা অতি অবশ্যই লিখে রাখা উচিত। তাঁর অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে বাড়ীতে যেতে হতেও পারে।

৩. **টাইপিস্টকে কপি হস্তান্তর ও নির্দেশ :** টাইপিস্টের অবসর মতো তাঁকে পাণ্ডুলিপির সব কিছু বুঝিয়ে দিতে হবে। থিসিসের কাজে ব্যবহৃত পরিত্যক্ত ফাইলগুলির থেকে তিনটি ফাইল তাঁকে দেওয়া হবে।

ক. পাণ্ডুলিপির ফাইল

খ. সাদা কাগজের ফাইল

গ. Typed copy-র ফাইল

তিনি তাঁর কাজ শুরু করবেন। চারটি করে কপি করতে বলবেন।

৪. Typed Copy গ্রহণ ও সংরক্ষণ: সপ্তাহের একটি বা দুটি দিন একটি শূন্য ফাইল সহ Typed Copyগুলি, হয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপি সহ ফিরিয়ে আনতে হবে। টাইপিস্টের কাছে পাওয়া Typed copyগুলি এভাবে বিন্যস্ত থাকে:—মনে করুন ৬টি পৃষ্ঠা ছাপা হয়েছে। ওপর থেকে নীচে এইভাবে থাকবে ৬ (১ম কপি) ৬ (২য়) ৬ (৩য়) ৬ (৪র্থ) ৫ (১ম) ৫ (২য়) ৫ (৩য়) ৫ (৪র্থ) ইত্যাদি করে শেষে থাকবে প্রথম পৃষ্ঠার ৪টি কপি।

এর পরে যতোগুলো Typed copy নিয়ে আসা হবে সেগুলির সবচেয়ে নীচে থাকবে ৭ পৃষ্ঠার ৪টি কপি। বাড়ীতে চারটি ফাইল প্রস্তুত থাকবে। তাতে একটি ১ম কপির ফাইল একটি ২য় কপির ফাইল, একটি ৩য় কপির ফাইল এবং একটি ৪র্থ কপির ফাইল।

পাণ্ডুলিপির সঙ্গে প্রথম পৃষ্ঠা থেকে ধারাবাহিক ভাবে পর পর পৃষ্ঠাগুলি মিলিয়ে নিয়ে ১ম কপি ২য় কপি ৩য় কপি ৪র্থ কপি অনুসারে পৃথক পৃথক ফাইলে সেগুলি উল্টিয়ে রাখা হবে। এতে টাইপিস্টের কাছ থেকে পর পর আসা Typed copy গুলো যথাক্রমে রাখা যাবে। Typed copy চারটি ফাইলে বন্দী হলে পেন্সিল দিয়ে ৪টি ফাইলের পাতাগুলির page নাম্বার দিয়ে দেওয়া উচিত। সাধারণতঃ গবেষকরা টাইপিস্টের কাছ থেকে শনিবারে Typed copy নিয়ে আসেন ও রবিবারে কাজ সারেন।

অন্য হরফের জন্য কোনো কোনো অংশ ফাঁকা থাকলে আগে সেগুলি টাইপ করে নেওয়া দরকার। তবেই Typed copy সম্পূর্ণ হবে। নিতান্তই অসুবিধার ক্ষেত্রে ছোটোখাটো অংশ পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে লিখে দেওয়া যেতে পারে। কারণ Typed copy জমা দেবার উদ্দেশ্য পরীক্ষকের দেখার সুবিধার জন্য, অন্য কারণে নয়।

৫. সংশোধন: টাইপিস্টের কাছে গবেষকের জ্ঞান আশা করা যায় না। তাই ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। তাই খুব সতর্কভাবে পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে Typed Copy-র ৪র্থ কপি সংশোধন করতে হবে এবং সংশোধনের নীচে কপি পেন্সিলে দাগ দিতে হবে। ৪র্থ

কপি সংশোধন হওয়ার পর সেটার লাল চিহ্ন দেখে দেখে ১ম, ২য় ও ৩য় কপি সংশোধন করতে হবে। শেষ মুহূর্তে বড়ো সংশোধনের দরকার হলে পৃষ্ঠা বাদ দিতে হবে ও নতুন করে ছাপতে হবে এমন করে যাতে পরবর্তী পৃষ্ঠার বক্তব্য বিঘ্নিত না হয়। পরবর্তী পৃষ্ঠার বক্তব্য যেখানে বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের সঙ্গে যুক্ত, তখন তা কেটে দেওয়া যেতে পারে—যদি পরিমাণে অল্প হয়। ছোট কোনো প্যারাগ্রাফ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নতুন একটা ছোট কাগজ টাইপ করিয়ে একই স্পেসের মধ্যে তা আঠা দিয়ে সেঁটে দিতে হবে। বর্জিত প্যারাগ্রাফ থাকলে সাদা কাগজের পট্টি দিতে হবে এবং ডান থেকে বামে নীচে একটি সরলরেখা টানতে হবে। এতে কাটাকাটির সৌন্দর্যহানি হয় না।

একটি টাইপ করা পৃষ্ঠার শেষ শব্দের সঙ্গে পরের টাইপ করা পৃষ্ঠার প্রথম শব্দের সঙ্গতি আছে কিনা কোনো শব্দ, শব্দগুচ্ছ বা বাক্য পৃষ্ঠার মধ্যে বাদ গিয়েছে কিনা, তা দেখে—যদি মনে হয় সেরকম কিছু ঘটেছে, তবে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখে দিতে হবে ছোট করে। অনেকে সরু কাগজের টাইপ করা ফালি পুরোনো টাইপ করা বক্তব্যের ওপরে সেঁটেও দেন।

শব্দের দুর্বোধ্যতায় শব্দের নামে অর্থহীন অন্য কিছু টাইপ করা হয়েছে কিনা, সে বিষয়েও গবেষকের সতর্কতা থাকা উচিত। ভুল বানান থাকলে তো সংশোধন করা উচিতই। সাধারণত টাইপিস্ট গবেষকের বানানই টাইপ করে থাকেন। কিন্তু ন-ণ ঘটিত, উ-কার ঊ-কার ঘটিত ইত্যাদি বানান তারা অসতর্কতায় ভুল করে বসেন। যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রেও তা হয়। যেমন—স্ক এবং ষ্ক ইত্যাদির ক্ষেত্র।

ফুটনোটগুলি কিংবা গ্রন্থশেষে প্রদত্ত নোটগুলি যথাযথ ভাবে সন্নিবিষ্ট হয়েছে কিনা—বিশেষ করে মূল বক্তব্যে চিহ্নিত সংখ্যার সঙ্গে সন্নিবিষ্ট তথ্যের সঙ্গে প্রদত্ত সংখ্যার মিল আছে কিনা, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দেখা উচিত।

৬. **পরবর্তী পদক্ষেপ :** চারটি ফাইল এইভাবে নির্দিষ্ট হবে।

১ম ফাইল—জমা দেবার জন্য পৃষ্ঠাগুচ্ছ

২য় ফাইল—জমা দেবার জন্য পৃষ্ঠাগুচ্ছ
৩য় ফাইল—জমা দেবার জন্য পৃষ্ঠাগুচ্ছ
৪র্থ ফাইল—নিজের কাছে রাখার জন্য পৃষ্ঠাগুচ্ছ।

সব ছাপা শেষ হলে Title Page ভূমিকা ও বিষয়সূচী টাইপ করিয়ে নিতে হবে। থিসিসে কোনো উৎসর্গ পৃষ্ঠা থাকে না। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে থাকতে পারে।

ক. Title Page অনেকে মুদ্রিত করেও দেন। না দিলেও ক্ষতি নেই। এই পৃষ্ঠায় থিসিসের শিরোনাম গবেষকের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ইত্যাদি থাকবে। মা কালী সহায় ইত্যাদি কোনো কিছু না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

খ. নিবেদন অংশে ঋণস্বীকার, কাউকে পরিতুষ্টির চেষ্টা, ব্যক্তিগত কথা ইত্যাদি না রাখাই রুচি সম্মত। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় ইচ্ছামতো ভূমিকা লেখা চলবে।

গ. বিষয়-সূচীতে Typed Copy (৪র্থ) দেখে দেখে পৃষ্ঠা সংখ্যা লিখে বসিয়ে দিতে হবে।

৭. **বাঁধাই ইত্যাদি :** নিজের সাধ্য ও রুচিমতো এবারে থিসিস বাঁধাই করে নিতে হবে। ৪র্থ কপি গবেষকের নিজস্ব হিসেবে বাড়ীতে থাকবে, ভাইভার জন্য কাজে লাগবে। জমা দেবার আগে থিসিসে সেন্ট বা আতর, পৃষ্ঠার ভাঁজে পুজোর ফুল বেলপাতা ইত্যাদি না দেওয়াই ভালো। যিনি সৎ গবেষক, ভগবান তাঁর সহায় এবং বিষয়বস্তুর সুরভি পরীক্ষককে আরো বেশি আকৃষ্ট করবে। সব কাজ শেষ-হলে তত্ত্বাবধায়ক বা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির সঙ্গে যাকিছু যোগাযোগ তা যথাযথ নিয়ম অনুসারেই করতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়

(ACCOMPANING PORTION)

[illegible]. সাহিত্য-গবেষকের জ্ঞানার্জন-ক্ষেত্র

সাহিত্য-গবেষককে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান সঞ্চয় করতে হয়। এই জ্ঞানগুলিকে কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করা চলে।

ক. পদ্ধতিগত জ্ঞান

খ. কিছু ব্যাবহারিক বাস্তব জ্ঞান

গ. সাহিত্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান

ঘ. পদ্ধতির প্রয়োগের জ্ঞান

ক ও ঘ অর্থাৎ সূচীকরণ, সারকরণ তালিকাপ্রণয়ন ইত্যাদি বিবিধ ধরনের পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। খ এবং গ সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোচনার অবকাশ থেকে যায়। প্রসঙ্গতঃ কিছু কিছু ব্যাবহারিক বাস্তব জ্ঞানের প্রসঙ্গে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এখানে আরও কিছু কথা জানানো দরকার।

এদেশে অর্থাভাবে—বিশেষ করে দায়িত্বজ্ঞান অভাবে গ্রন্থসংরক্ষণে বৈজ্ঞানিক সহায়তা দেওয়া বা নেওয়ার তেমন চেষ্টা নেই। কোনো কোনো পুরোনো ছাপার কাগজ পাঁপড়ের মতো ভঙ্গুর হয়ে যায়। এগুলি বিশেষ প্রক্রিয়ায় ব্যবহারোপযোগী নরম করে তোলা যায়। বলা বাহুল্য এসবে গুরুত্ব দিতে গেলে দলাদলির সময়াভাব ঘটে। তাই এভাবেই বইগুলি নষ্ট হয়ে যায়।

তাছাড়া ভঙ্গুর পৃষ্ঠা পাঠ করবার উপযুক্ত শিক্ষা এদেশে অনুসন্ধিৎসু শিক্ষিত পাঠকেরও নেই। সাধারণ বইয়ের পৃষ্ঠাই ওপরের ডান দিকে ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমার সাহায্যে ওল্টাতে হয়,—এই বোধটুকুও জানা নেই। অনেকে তো পৃষ্ঠার নীচের কোন-অংশ কুঁচকিয়ে তোলেন, এমন কি অনেকে থুতুও লাগান। এ সব অভ্যাস তাঁরা যেখান থেকেই পান না কেন, তা ত্যাগ করে তাঁদের সভ্যসমাজের উপযুক্ত গ্রন্থ ব্যবহারকারী হওয়া উচিত। পেজ-মার্কের জন্য কেউ কেউ দেখা যায় পৃষ্ঠা দুমড়ে রেখে বই বন্ধ করে রাখেন—পরের নির্ধারিত সময়ে এসে পড়বেন বলে। এতো কয়েক বছর পর

ঐ ভাঁজটা কেটে যায়। কিছুটা ভঙ্গুর ধরনের হলে তো কথাই নেই। দেখা গেছে এভাবে বহু পত্র পত্রিকা ও বই তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বহু বই করার সময় পাতা যেন ভাঁজ না হয় কিংবা কুঁচকে না যায়।

ভঙ্গুর পৃষ্ঠার বই পড়তে গেলে ডানদিকে হাতের কাছে টেবিলে একটা চ্যাপ্টা রবার-প্ল্যাস্টিক ধরনের (মেটালের নয়) জিভ ছোলা রাখতে হয়। বাঁ হাতে ডানদিককার পৃষ্ঠার ওপরের অংশ ধরে এবং ডান হাতে জিভ ছোলাটি পরের পৃষ্ঠার ভেতরে প্রবেশ করিয়ে সন্তর্পণে পৃষ্ঠা তুলতে হয়। বাঁ হাতের ঘাম যেন বাঁ পৃষ্ঠায় কখনো না লাগে— বাঁ হাতের চাপও যেন না লাগে। ভুলেও কখনো বাঁ পৃষ্ঠায় হাতের চাপ দেবেন না। খুব ভঙ্গুর পৃষ্ঠা হলে পৃষ্ঠাটি বইয়ে লম্ব আকারে রেখে কিংবা বাঁ পৃষ্ঠার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না করে, কভারশুদ্ধ অংশ খাড়া করে তুলে ধরে পঠনীয় বক্তব্য পড়া উচিত। দরকার হলে পৃষ্ঠার গোড়ায় একটা পেন্সিল রাখা যাবে। পেন বা স্কেল রাখা ঠিক নয়।

দুষ্প্রাপ্য (Rare) বইগুলিতে কোনো ধরনের মন্তব্য লেখা উচিত নয়। অনেক সময় অনেক পুরোনো বইয়ে তখনকার দিনের পাঠকরা হয়তো কিছু নোট রেখেছিলেন। সেগুলোও কোনো একদিন গবেষণার উপকরণ হতে পারে। দুষ্প্রাপ্য বইয়ের পাতা ছিঁড়ে নেওয়া চৌর্যবৃত্তির পর্যায়ে পড়ে এবং তা পুলিশের এক্তিয়ারভুক্ত।

অনেক সময় দেখা যায়, যে কোনো কারণেই হোক. বই বা পত্র-পত্রিকার একাধিক পৃষ্ঠার কাটিং করা দিক জুড়ে যায়। সেই অংশ, কিংবা জোড়াপাতা আবিষ্কৃত হলে জিভ ছোলাটি কাজে এসে যাবে। অতি সন্তর্পণে পৃষ্ঠাগুলি পৃথক করে নিতে হবে।

অনেক সময় গবেষককে ময়লা রেকর্ড ঘাঁটতে হয়। বিদেশে যেমন রেকর্ড পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা আছে, তেমনি আছে গবেষণার সহায়তায় সংরক্ষণকারীর পক্ষে সক্রিয়তার ব্যবস্থা। এদেশে তার কোনোটিও না থাকায় গবেষককে উপযুক্ত প্রস্তুতি নিতে হয়। এসব ক্ষেত্রে গামছা

বা তোয়ালে এবং লাইফবয় জাতীয় সাবান সঙ্গে রাখা উচিত। অ্যাপ্রন্ না থাকলে ঐ সব কাজের সময় ভালো পোষাক সাময়িকভাবে ছেড়ে বাজে পোষাক পরে নিতে হবে।

কোনো রেকর্ড বা বই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিংবা সিলভার ফিস্ পোকা তাতে রয়েছে বুঝতে পারলে প্রথমে পোকা মেরে ফেলা উচিত, এবং গ্রন্থের কর্তৃপক্ষকে এ-বিষয়ে জানানো উচিত, এটা গবেষকের নৈতিক কর্তব্য।

রেকর্ড ঘাঁটাঘাঁটি বা লাইব্রেরী ওয়ার্কের সময় টিফিনের চাহিদা জাগতে পারে। টিফিনের আগে হাত ধুয়ে নেওয়া উচিত ভালো করে। কারণ অনেক সময় বইয়ে পত্রিকায় বা রেকর্ডপত্রে বিষাক্ত গ্যামাক্সিন ইত্যাদি পাউডার দেওয়া হয়। বিষাক্ত কিছু না দেওয়া হলেও জীবাণুও থাকতে পারে।

বই, পত্রপত্রিকা বা রেকর্ডের কোনো পৃষ্ঠার ছবি নিতে গেলে কর্তৃপক্ষের সম্মতি নিতে হবে। যিনি ফটোগ্রাফার, তাঁর প্রবেশের বা কাজের অনুমতিও নিতে হবে। দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহশালার বাইরে আনা অনুচিত।

আতসী কাঁচ গবেষকের কাছে থাকা দরকার। অনেক হরফ—বিশেষ করে পাণ্ডুলিপির—দুর্বোধ্য হলে আতসী কাঁচ সহায়তা করে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুদ্রিত গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা পাঠের সময়ও কাজে এসে যায়।

বর্ষাকালে পলিথিনের প্যাকেট কাগজপত্র বাঁচিয়ে দেয়। ব্লেড, পেনসিল, ইরেজার কিছু বাড়তি রিফিল—এসব টুকিটাকি জিনিস রাখলে অনেক সময় কাজে এসে যায়। আলপিন, ক্লিপ ইত্যাদি দু-চারটি কাছে রাখা উচিত।

তালপাতার পুঁথি জুড়ে গেলে চারপাশের কাটা অংশ কাৎ করে ব্লেড ঘষতে হবে। জায়গাগুলি পরিষ্কার হলে পৃষ্ঠা খুলে যাবে। অনেক সময় ভাপ দিলে খুলে যায়। অবশ্য বিভিন্ন কারণে পাতা জুড়ে যায়। তাই অসুবিধা বোধ হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

গবেষককে বাইরে যেতে হলে সে ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে। কী কী দরকার হয় বাইরে যেতে গেলে, সে-সম্পর্কে ধারণা তো আছেই। এরপর গবেষণার কাজে কোন কোন জিনিস লাগবে, সেটাও ভেবে নিতে হবে। তাহলেই জিনিসপত্রের তালিকা শেষ। তাছাড়া অন্যান্য বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার যা কিছু বিক্ষিপ্ত লেখাজোখা—সবকিছু ছোটো ছোটো অক্ষরে লিখতে হবে। বাঁদিকে মার্জিন একটু চওড়া থাকবে এবং দুটি লাইনের মধ্যে স্পেস্ একটু বেশি থাকবে। এতে লেখার ফাঁকে এবং বামদিকে কিছু মন্তব্য লেখা যেতে পারে।

গবেষণার কাগজপত্রের জন্য নিজের ঘরে পৃথক টেবিল থাকবে। ফাইল ইত্যাদি সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে। একাধিক পেপার ওয়েট টেবিলে থাকবে। গবেষণা করতে করতে যা কিছু পরিত্যক্ত বা বর্জিত কাগজ তা ফেলে না দিয়ে একটি ছোটো প্যাকিং বাক্সে পেতে পেতে রাখতে হবে। গুচ্ছ কাগজ থাকলে সবকিছু এক ভাঁজ করে পেতে রাখতে হবে। যে কোনো মুহূর্তে কাগজগুলি দরকার হতে পারে। এমনকি গবেষণা শেষ হয়ে গেলেও এই কাগজগুলির উপাদান বাই-প্রডাক্ট হিসেবে অন্য কোনো পরিকল্পনায় সহায়তা করতে পারে। এই সব কাগজে যাতে পোকা না লাগে, সেজন্য দুচারটে ন্যাপথালিন বাক্সে ফেলে রাখা যেতে পারে। ইচ্ছা করলে ট্রাঙ্কেও রাখা যায়। তবে বার বার ট্রাঙ্ক খুলে কাগজ রাখা বিরক্তিকর। প্যাকিং বাক্সে ওপরের কাগজের ওপর সর্বদা একটা চীনেমাটির প্লেট উপুড় করে রাখা যেতে পারে। এতে কাগজ এলোমেলো হয়ে যাবে না।

সাহিত্য সম্পর্কিত বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট মাপের যে জ্ঞানের কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে মোটামুটি একটু ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে।—

১. সাহিত্যতত্ত্ব জ্ঞান ২. সাহিত্যের রূপভেদ জ্ঞান ৩. সাহিত্য সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিভাষা জ্ঞান ৪. সাহিত্যের ইতিহাস জ্ঞান

৫. লেখক কেন্দ্রিক ইতিহাস জ্ঞান ৬. সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস জ্ঞান ৭. সাংস্কৃতিক ইতিহাস জ্ঞান ৮. আলংকারিক ইতিহাস জ্ঞান ৯. বিষয়কেন্দ্রিক সাহিত্য পরিবেশ জ্ঞান' ১০. বিষয়কেন্দ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ জ্ঞান ১১. বিষয়কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস জ্ঞান ১২. ব্যক্তি পরিবেশ ও সাহিত্যসৃষ্টির সম্পর্ক জ্ঞান ১৩. তুলনামূলক সমগোত্রীয় ভাষা জ্ঞান ১৪. তুলনামূলক সমগোত্রীয় ভাষা জ্ঞান ১৫. তুলনামূলক সমগোত্রীয় চিন্তা ও ভাবনা জ্ঞান ১৬. তুলনামূলক সমাজ ও অর্থনৈতিক স্বরূপ জ্ঞান ১৭. তুলনামূলক সাংস্কৃতিক স্বরূপ জ্ঞান ১৮. আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিবিধ জ্ঞান।

আমাদের অ্যাকাডেমিক সাহিত্য শিক্ষার মধ্যে অপূর্ণতা যে কতোখানি থাকে, তা এইসব বিষয় নাড়াচাড়া করতে গিয়ে আবিষ্কার করা সম্ভব হবে। কোনো কোনো বিষয়ে হয়তো প্রাথমিক জ্ঞানও নেই। এই জ্ঞানগুলির মধ্যে ভারসাম্য না এলে গবেষকের মনের সক্রিয়তা আসবে না। যাঁরা একথা বিশ্বাস করেন না, তাঁরা মনের বাস্তব গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে যেমন অজ্ঞ, তেমনি জ্ঞান সঞ্চয়ের ব্যাপারে পলায়নবাদী ও সুবিধাবাদী।

গবেষকদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, বই, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের বস্তু আসলে নিজের অন্তরের জ্ঞানভাণ্ডারের এক একটি দল উন্মুক্ত করে তুলবে। নিজের অন্তরে একটা সূর্য ঘুমন্ত অবস্থায় আছে, তাকে জাগাতে হবে।

---

১০. সাহিত্য-গবেষণাগত সমস্যা

আমাদের গোটা সমাজের মধ্যেই আদর্শবোধটা যেন ক্রমে ক্রমে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। সমাজের একটা অংশ হচ্ছে শিক্ষা, আবার এই শিক্ষার মধ্যেই রয়েছে গবেষণা। তাই আজ গবেষকদের মধ্যে আদর্শ বোধটা যেমন অন্তর্হিত-প্রায়, তেমনি একই অবস্থা লক্ষ্য করা যায় গবেষণা-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যেও। প্রলোভন, সুবিধাবাদ, ব্যক্তিত্ব-সংঘাত, রাজনৈতিক দলাদলি, বঞ্চনা স্বার্থপরতা—সবকিছুই গবেষক ও সংশ্লিষ্ট সমাজকে কলুষিত করেছে। সাহিত্য-গবেষণার মূল সমস্যা এখানেই নিহিত আছে।

বিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণার মধ্যে আপাত লাভ আছে—যা সাহিত্য-গবেষণায় নেই। তাই বৈজ্ঞানিক গবেষণার তুলনায় সাহিত্য-গবেষণায় জাতীয়-নেতৃত্ব থেকে তেমনভাবে উৎসাহিত করা হয় না। বৈজ্ঞানিক গবেষণা অপেক্ষাকৃত ব্যয়-সাপেক্ষ হলেও সেখানে যে আনুকূল্য পাওয়া যায়, উত্তীর্ণ গবেষক পরবর্তীকালে যে সুযোগ-সুবিধাগুলি পান, সাহিত্য-গবেষণার ক্ষেত্রে তা তেমন নেই বললেই চলে। যেটুকু আছে, তা শুধু চক্ষুঃলজ্জা ঢাকবার মতোই। তাই সাহিত্য-গবেষণা অনেকটাই অবহেলিত।

সাহিত্য-গবেষণার পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা নিয়েই এদেশে সাহিত্য-গবেষকদের অগ্রসর হতে হয়। যাঁরা গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক, এবং যাঁরা গবেষক—উভয় পক্ষেরই একই অবস্থা। কতকগুলি গবেষণা-গ্রন্থের আদর্শ সামনে রেখে গবেষণার কাজের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতে এক-একটি গবেষণার কাজ শেষ করা হয়। এতে গবেষকের যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়। সম্প্রতি অবশ্য পদ্ধতি-শিক্ষণের প্রচেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু পদ্ধতিগুলি প্রকারান্তরে লাইব্রেরী-সায়ান্স, ডকুমেন্টেশন সায়ান্স, জার্নালিজম বা ইনফর্মেশন সায়ান্সের জগা-খিচুড়ী পদ্ধতি,—অর্থাৎ কিছু নিষ্প্রাণ পরিভাষার সমষ্টি। এগুলিকে প্রয়োগ করবার মতো শিক্ষাদানের যথেষ্ট অভাব আছে বলে মনে হয়।

এদেশে ব্যাক্‌-আপ্‌ সার্ভিস নেই—অন্ততঃ এই লাইনে। প্রয়োজনমতো ইনফর্মেশন পেতে গবেষককে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়। বিদেশী ভাষার কোনো তথ্য বঙ্গানুবাদ করে দেবার মতো কেউ প্রস্তুত নেই। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তথ্য-সংগ্রহ করতে গিয়ে যেখানে সরকারী কর্মচারীর দ্বারস্থ হতে হয়, সেখানে উক্ত কর্মচারীদের আচরণ দেখে মনে হয়, শুধু বেতন নেবার মৌলিক অধিকারই তাঁদের আছে, কাজ করাটা তাঁদের মর্জি।

লাইব্রেরীগুলির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। Readers' Guidance দেবার কেউ নেই। যেখানে সেরকম একটা ব্যবস্থা কাগজে-কলমে আছে, সেখানে তাঁদের নিজেদের প্রাপ্য বিষয়ের জ্ঞানটাই যেন মুখ্য। অন্যদিকে Referral Service-এর উল্লেখ না করাই ভালো। এদেশের পাঠাগার বা সংগ্রহশালাগুলির মধ্যে আত্মিক-সংহতি গড়ে ওঠে নি। তাই একটি পাঠাগার বা সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষ বলতে পারবেন না যে, কোন্‌ পাঠাগার বা সংগ্রহশালায় পেলে গবেষকের নির্দিষ্ট চাহিদা মিটবে। অনেক পাঠাগারেই সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই ; সে বিষয়ে তেমন বোধও নেই। অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য-সমৃদ্ধ বই Weed Out করে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এযুগের সস্তা উপন্যাস বা কেচ্ছাকাহিনীর বই—যা সদস্য টানবে। যে কোনো বইয়ের যে কোনো দিক থেকে গুরুত্ব থাকতে পারে, এই বোধের যথেষ্ট অভাব আছে। অনেক সময় ব্যক্তিস্বার্থ বা গোষ্ঠীস্বার্থ থেকেও বই কেনা না কেনা, বই রাখা না রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এদেশে পাঠ্যপুস্তক সংরক্ষণের লাইব্রেরী নেই, শিশু-সাহিত্য সংরক্ষণের লাইব্রেরী নেই গবেষকদের জন্য। টেক্সটবুক লাইব্রেরী বা শিশু-পাঠাগার অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে গড়া। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রচুর থিসিস Typed Copy হিসাবে গুদামে বন্দী হয়ে আছে। অথচ সেগুলি গবেষক বা অন্যান্য সন্ধানী ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত করে দেবার কোনো ব্যবস্থা নেই, সেগুলির কোনো পাঠাগার নেই। নেই অনেক কিছুই। নেই—এই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবার মতো মানুষও।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সূচীকরণ ও সারকরণ সমবায়িকভাবে করবার কোনো সংস্থা নেই। অন্ততঃ সাহিত্য-গবেষণার ক্ষেত্রে এ-বিষয়ে সরকার পক্ষ থেকেও তেমন ব্যবস্থা নেই। কোন্ কোন্ পত্র-পত্রিকায় কী কী বিষয়ে প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে, তা জানবার জন্য গবেষকের সাধ্যাতীত পরিশ্রম করা সম্ভবপর নয়। তাই প্রকাশিত অনেক প্রবন্ধ সম্পর্কে গবেষক অজ্ঞই থেকে যান। এর ফলে সাহিত্য গবেষণার জগতে মনোন্নয়নের গতি হয়ে পড়েছে মন্থর।

বিভিন্ন সংস্থা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন সংস্থা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সম্পন্ন বিশেষ ভাষায় সাহিত্য-গবেষণার তালিকা সাল-ভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক ভাবে খণ্ড-আকারে প্রকাশ করা হয় না। এগুলি করা হলে এলোমেলো সাহিত্য-গবেষণা, একই বিষয়ে ও একই পদ্ধতিতে একাধিক সাহিত্য-গবেষণার অর্থহীন প্রচেষ্টা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনালোকিত অবস্থা থেকে যাওয়া—এসব বন্ধ হতে পারে। বিশেষজ্ঞ পরিষদের উচিত অনালোকিত বিষয়গুলিকে গবেষণায় উৎসাহী ব্যক্তিদের সামনে তুলে ধরা। অবশ্য বাইরের থেকে প্রস্তাবিত কোনো চিন্তা-ভাবনা ও শিরোনাম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হলে তাঁদের পক্ষ থেকে সেগুলিও গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রাক্তন সম্পন্ন-গবেষণার তালিকাগুলি প্রণয়ন করা এখন শ্রম-সাপেক্ষ, ব্যয়-সাপেক্ষ ও সময়-সাপেক্ষ। এক্ষেত্রে সমকালীন সম্পন্ন-গবেষণার তালিকা প্রণয়নের কথা চিন্তার বাইরে। এর সঙ্গে আবার গবেষণার নির্যাস দেওয়া থাকবে.—এটা এখন বর্তমান গ্রন্থাকারের কাছে অবাস্তব কল্পনা-বিলাস বলেই মনে হবে। তবু ভাবতে কী দোষ আছে ?

অন্য দেশে সমবায়িকভাবে চলমান-গবেষণার তালিকা দেওয়া হয়ে থাকে। এদেশে—অন্ততঃ সাহিত্য-গবেষণার ক্ষেত্রে তার কোনো ব্যবস্থা নেই। সম্পন্ন-গবেষণা ও চলমান-গবেষণার তালিকার অভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একই গবেষণা একই ভাবে একাধিকবার যে করা

হয়ে থাকে, এ দৃষ্টান্তও আছে। যে গবেষণা-গ্রন্থ অপ্রকাশিত আকারে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুদামে থেকে যায়, সেই একই রকম অন্য একটি গবেষণা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের গুদামে Typed আকারে থেকে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

আমাদের সাহিত্য-গবেষণার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সাহিত্যের সঙ্গে অন্যান্য বিভিন্ন সাবজেক্টের প্রসঙ্গ এসে যায়। গবেষকদের সহায়তার জন্য বিভিন্ন সাবজেক্টের বিশেষজ্ঞ নিয়ে প্রস্তুত 'উপদেষ্টা পর্ষদ' কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে চোখে পড়েনি। এই জাতীয় পর্ষদ না থাকার ফলে গবেষকরা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি মতো যা-কিছু লেখার লেখেন। আবার অপরিহার্য উক্ত ভিন্ন সাবজেক্ট সম্পর্কে তেমন জ্ঞানের অভাবে অথচ মর্যাদানাশের অহেতুক ভয়ে পরীক্ষকরা নিজেদের জ্ঞানের দীনতা গোপন করে গবেষণার উত্তরণ ঘটিয়ে দেন। অথচ অনেক সময়েই দেখা যায়, সেইসব সাবজেক্ট সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞানসম্পন্ন পাঠকের কাছে গবেষণায় বিধৃত সেই সব সাবজেক্ট-সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গগুলি হাস্যকর হয়ে ওঠে। অনেক গবেষণাতেই একাধিক সাবজেক্ট-সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ থাকতে পারে। তাই এক্ষেত্রেও একটা পর্ষদ গঠন করা উচিত—যেখানে পরীক্ষক সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি যাচাইয়ের সুযোগ পাবেন।

আমাদের সাহিত্য-গবেষণার পরিধি সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। সাহিত্য-বিষয়ক গবেষণার মধ্যে কোনো সাহিত্যিকের রাজনৈতিক চেতনা, কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠী সম্পর্কে গবেষণা, কোনো গোষ্ঠীর ভাষা সম্পর্কে গবেষণা যথাক্রমে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞানের গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হবে—কি সাহিত্য-গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হবে, সে-বিষয়ে আমাদের পরিচ্ছন্ন ধারণা নেই। অন্তত: প্রথম ধরনের একটি গবেষণা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য-গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আবার অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এটা প্রামাণ্য তথ্য। এ বিষয়ে আমাদের একটা পরিচ্ছন্ন সিদ্ধান্তে আসতে হবে। কারণ এ জাতীয় গবেষণার ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক বা পরীক্ষককে বিব্রত হতে হয়। যদি কেউ

'রবীন্দ্রনাথের বিভিন্নকালীন অসুস্থতা ও ঔষধপ্রয়োগ' নিয়ে গবেষণা করতে চান, তাহলে তো রবীন্দ্রনাথের নামে সাহিত্য-গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে! এ-বিষয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা আরো পরিষ্কার হওয়া উচিত।

এদেশে গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশ করবার জন্য প্রকাশকের মধ্যে উৎসাহের লক্ষণ নেই। তাঁরা ব্যবসা করতেই আসেন, সংস্কৃতির বাঁচা-মরা নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা নেই। একসময়ে যেটুকু বা ছিলো, তা নষ্ট হয়ে গিয়ে তাঁরা এখন বড়বাজারের সুপরিচিত একজাতীয় মানুষদের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছেন। একটি সঙ্কীর্ণ অঞ্চলের ভাষার অন্তর্ভুক্ত অতি সীমিত ক্ষেত্রের পাঠকের জন্য প্রকাশক এই দুর্মূল্যের বাজারে বেশি টাকা লগ্নী করতে অনিচ্ছুক। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ই সেইসব গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারতেন —আর্থিক প্রাচুর্য থাকলে। হয়তো ভাগ্যবান দু'একজন গবেষক— গবেষণার মান যা-ই হোক, এই সুযোগ পেয়ে থাকেন। অনেক গ্রন্থই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কালযাপন করে। সচ্ছল গবেষকরা নিজের খরচে হয়তো ছাপেন, কিন্তু বিক্রীর পথ তাঁদের জানা নেই।

এবারে গবেষকের প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। আধুনিক শিক্ষা-ধারা এমনই যে, ছাত্রদের মনে মৌলিক চিন্তা গড়ে ওঠার তেমন অবকাশ আর এখন নেই। তারা যেন এক-একটি তথ্য সরবরাহের মেশিন হয়ে গড়ে উঠছে। নিতান্ত প্রতিষ্ঠা বা অর্থের প্রয়োজনেই যেন গবেষণায় অগ্রসর হয়ে থাকেন। স্নাতকোত্তর শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তার ব্যাপারে তেমন উৎসাহ দেওয়া হয় না এবং শিক্ষকরাও উৎসাহিত নন। একটা সময় ছিলো—যখন স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্ষেত্রের অধ্যাপকরা অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এখন এই স্তরের অধ্যাপক এক-একজন নোট-মেকার মাত্র। বললে কি মিথ্যা বলা হয়? তাঁরা জানেন, যেহেতু তাঁরা পড়ান ও প্রশ্ন করেন, তাই তাঁদের নোটবই ছাত্ররা কিনতে বাধ্য, এতে অর্থাগম হবে।

মৌলিক চিন্তার বই কয়জনই বা কিনবে? শিক্ষণের শিথিলতা ছাত্রদের ব্যাপকভাবে শর্টকাটের দিকে আকৃষ্ট করেছে। তাই এম্-এ পাশ করেও গবেষণার ক্ষেত্রেও তাঁরা শর্টকাট খোঁজেন। এইজন্যই যথারীতি দুর্নীতি তাঁদের গ্রাস করে।

দুর্নীতিগুলির মধ্যে একটি প্রধান দুর্নীতি হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ককে তোষণ। এ ব্যাপারে তাঁরা সবকিছু করতেই রাজী। তেমন যোগাযোগ থাকলে তত্ত্বাবধায়কের প্রচেষ্টায় বাধ্য পরীক্ষকও জুটে যান। সে সব ক্ষেত্রে যথারীতি নিম্নস্তরের গবেষণাও উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তবে সেখানে গবেষকের সঙ্গে একটা শর্ত হয়ে যায়, এই গবেষণা গ্রন্থাকারে যেন প্রকাশ না পায়। বলা বাহুল্য এখানে গবেষণার চেয়ে ডিগ্রীকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়।

অত্যন্ত অপ্রিয় হলেও একথা সত্য যে, বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যে যাঁরা অগ্রসর হন তাঁদের মধ্যে অনেকেরই এই পথ বেছে নেবার একটি কারণ ইংরেজি ভাষায় জ্ঞানাভাব। এদেশে অনুবাদক-পরিষদ নেই। তাই ইংরেজি ভাষার জ্ঞানাভাব নিয়ে বাংলা সাহিত্যের অনেক তথাকথিত কৃতী এম্-এ অনেক অসুবিধা বোধ করেন। পৃথিবীর যাবতীয় প্রথম শ্রেণীর ক্রিয়েটিভ বই বা আলোচনার বই ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। গবেষকদের সামনে সেসব বইয়ের ব্যাপারে একটা কালো পর্দা ঝুলছে। উঞ্ছবৃত্তির মতো অপরের অনুবাদের কিছু ছিটেফোঁটা সংগ্রহ করে পাশ্চাত্য বিদ্যা জাহিরের মাধ্যমে যেন তাঁরা কিছুটা আভিজাত্য অর্জনের চেষ্টা করেন।

শিক্ষাধারার বৈশিষ্ট্যের জন্যই হোক বা পরিবেশ প্রভাবেই হোক, সাহিত্যের বিস্তৃত বিষয়গুলির জ্ঞান সম্পর্কে ছাত্রমহলে অনাগ্রহ দেখা যায়। আমরা ছাত্রদের মধ্যে সর্বাত্মক জ্ঞান বা 'The Nineteenth Century Intellect' আশা করি না, কিন্তু নির্দিষ্ট বিষয়েও গভীর জ্ঞান প্রত্যাশা করি। কোনো গ্রন্থকারের যে গ্রন্থ পাঠ্য, সে গ্রন্থ ছাড়া তাঁর অন্য গ্রন্থ পড়বো না—এটাই যেন আমাদের ছাত্রদের প্রবণতা। সিলেবাসের চাপ নয়, মানসিকতার অভাব, সময় দিতে

অনিচ্ছা। এমনকি এঁরা পাঠ্যগ্রন্থের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তরই তৈরী করেন —অন্য অংশ বাদ দিয়ে। এক্ষেত্রে পাঠ্যবহির্ভূত বই এঁরা পড়বেন কেন ? রেজাল্টের মধ্য দিয়েই হয় বিদ্যার বিচার ও চাকরির সুযোগ। তাই অনাবশ্যক জ্ঞানার্জন না করে সেই শ্রমটুকু সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরের ব্যাপারে লাগালে জ্ঞানী না হয়েও কৃতী ছাত্র হওয়া যায়, অধ্যাপনাও জুটে যায়। একজন এম্-এ ছাত্র বাংলা গদ্যসাহিত্যে রামমোহনের দান সম্পর্কে সাজানো ভাষায় পাতার পর পাতা লিখে যেতে পারেন। কিন্তু রামমোহনের কোনো বইই তিনি পড়েননি—যেহেতু তাঁর বই পাঠ্য তালিকায় নেই। এটা ঘটনা। এই অবস্থায় এম্-এ পাশ করবার পর অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত জ্ঞানকে কেন্দ্র করে মৌলিক চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিতে গবেষক-নির্বাচনের জন্য একটা পরীক্ষা গ্রহণ করা উচিত। প্রাগ্-গবেষণা কোনো কোর্স পরিকল্পিত হলেও তা হওয়া উচিত এতাবৎ পঠিত সাহিত্য-জ্ঞানের পরিপূরক।

গবেষণার জন্য কিছুটা মানসিক প্রস্তুতি থাকা দরকার বলে বর্তমান গ্রন্থকার মনে করেন। সেই প্রস্তুতি তাঁরা কতোটা অর্জন করতে পারলেন, সে বিষয়েও একটা ভাইভা হওয়া দরকার। কথাবার্তার মধ্য দিয়ে গবেষকের মানসিক প্রস্তুতি কিছুটা পরিমাপ করা হয়তো সম্ভব হবে।

গবেষকদের কিছু ব্যাবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এগুলি গবেষক-প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এগুলি জানা না থাকলে তাঁরা যেমন নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হন, তেমনি অপরেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন।

পূর্বোক্ত শর্টকাটে আকর্ষণের জন্য অনেক গবেষকই লাইব্রেরী-সর্বস্ব সংক্ষিপ্ত শ্রমের কাজই বেশি পছন্দ করেন। এঁরা নিজেদের দীনতা গোপন করবার জন্য অপরের কাছ থেকে পাওয়া ঋণ আত্মসাৎ করে থাকেন। শেষে একটা বিরাট গ্রন্থপঞ্জী দিয়ে নিজেদের বিদ্যাবত্তা জাহির করেন। দেখা যাবে, অনেক বইই তাঁরা স্পর্শ পর্যন্ত করেননি। অন্য বইয়ের ফুটনোটে সেই বইয়ের নাম জেনেছেন মাত্র। এগুলি

দুর্নীতি ছাড়া কিছু নয়। তাছাড়া কল্পিত উপাদানকে তথ্যের নামেও অনেকে সরবরাহ করে থাকেন। তাকেও দুর্নীতি আখ্যা দেওয়া যায়। পরীক্ষায় দুর্নীতির ক্ষেত্রে যেমন শাস্তি আছে, তেমনি দুর্নীতিমূলক গবেষণার ক্ষেত্রে শাস্তি থাকা উচিত। তত্ত্বাবধায়ক ও পরীক্ষকের দুর্নীতি প্রসঙ্গেও একই পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

কিছু অবৈজ্ঞানিক ধারণা পাঠ্যাবস্থা থেকেই গবেষকের মনকে অধিকার করে থাকে। এগুলি কাটানো দরকার। যেমন,—মধ্যযুগে বাংলাগদ্যে কেন পুঁথি লেখা হয় নি, তা নিয়ে বক্তব্যগুলির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। পুরোনো যুগের কিছু পয়ার রচনার অক্ষম দৃষ্টান্ত দেখিয়ে এখনো কেউ কেউ বোঝাতে চেষ্টা করেন, কীভাবে পদ্যের খোলস ছেড়ে গদ্য মাথা তুলতে চাইছে। কেউ বা পয়ারের স্থিতিস্থাপকতা গুণের উল্লেখ করে থাকেন মহাজন-বাণী হিসেবে। আসলে কিন্তু চর্যার যুগেই লৈখিক বাংলা গদ্যেরও জন্ম। মৌখিক গদ্য তো ছিলোই—মানুষে তো আর পদ্যে কথা বলতো না। গদ্যে পুঁথি লেখা হয়নি, তার কারণ, গ্রন্থ-প্রচারের মাধ্যম ছিলো গানের আসর। গদ্যে সুর তাল দেওয়া যায় না। তাই পদ্যেই বই লেখা হতো। চিঠিপত্র দলিল দস্তাবেজের তো প্রচারের দরকার ছিলো না। তাই সেগুলি গদ্যেই লেখা হতো। গদ্যে 'সাহিত্য' করা হয়নি বলেই তার উৎকর্ষ নিয়ে আগে হয়তো মাথা ঘামানো হয় নি। তবে এম্-এ পাশ ছাত্র যখন শিক্ষক হয়ে পড়ান, 'উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের জন্ম', তখন হাসি সম্বরণ করতে হয়।

আমরা জানি, বাঙালীরা খাঁটি অনার্য। অথচ আমরাই বাংলা ভাষার ইতিহাস শুরু করি সুপ্রাচীন আর্য উৎস থেকে। তখন আর্য ও আর্যভাষার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই ছিলো না। আসলে যে সময় বাংলা ভাষাতত্ত্বের চর্চা শুরু হয়, তখন আমরা বিশ্বাস করতাম, আমরা আর্য। কিন্তু এখনো ভাষাতত্ত্বের বইয়ে 'অনার্য প্রভাব' কথাটা লেখা হয়ে থাকে।

বহুদিন থেকে এসব নানান ব্যাপার সাহিত্যের ছাত্রদের মনে

সংস্কারের মতো দানা বেঁধে আছে। এসব কাটিয়ে না উঠলে মস্তিষ্ক খেলবে কী করে ?

পুঁথি-বিচারে অবৈজ্ঞানিকতা অনেক ক্ষেত্রেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। বংশ-লতিকা দেখে কেউ তিনপুরুষে আবার কেউ বা চার পুরুষে একশো বছর হিসেব করে কোনো ব্যক্তির কাল নির্ণয় করেন বিজ্ঞের মতো,—যেন তাঁদের কথাই শেষ কথা। পুঁথির লিপির ছাঁদ দেখে কাল নির্ণয় প্রচেষ্টা ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হলেও সেই প্রচেষ্টাও সহাবস্থান করছে। লিপি সবক্ষেত্রেই কাল নির্ধারক নয়। রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল—দু-ধরনেরই লিপিকার থাকতে পারেন। ভাষার ক্ষেত্রেও সেই একই মন্তব্য প্রযোজ্য। কাল নির্ণয় নিতান্তই যেটুকু সম্ভব, তা মোটা দাগেরই শুধু হতে পারে।

শব্দপ্রয়োগ দেখে আধুনিকতা-অনাধুনিকতা বিচার সর্বদাই বিজ্ঞান-সম্মত নয়। তাছাড়া, যে কোনো লোকশ্রুতি—উৎসমূলে কল্পনা ভিত্তিকও হতে পারে। পারিবারিক মহিমাবৃদ্ধির জন্য অনেক সাহিত্যিকের বংশধর কল্পিত ভাষণও দিয়ে থাকেন। তাছাড়া বিখ্যাত ব্যক্তি হলে যে অনৃত ভাষণের কৌশল জানেন না, এই সংস্কার আঁকড়ে থাকা উচিত নয়।

এসব প্রসঙ্গের তালিকা না বাড়িয়ে বলা যেতে পারে যে, অনেক সংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক ধারণা আমাদের গবেষণার কাজের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। এই সব সংস্কারের ভূত ঘাড় থেকে নামানো দরকার। মোটকথা আমাদের গবেষণার কাজের মধ্যে তখনই স্বাভাবিকতা আসবে, যখন বিচিত্র ধরনের সংস্কারগুলি কাটিয়ে আমরা মৌলিক চিন্তায় পদক্ষেপ করতে পারবো।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সাহিত্য বিভাগের সঙ্গে বিজ্ঞান বিভাগের ক্ষীণ সম্পর্কটুকুও নেই। পুঁথির অবয়বের প্রাচীনত্ব বিচার থেকে শুরু করে যে কোনো বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পর্কিত সমস্যার জন্য বিজ্ঞান-কলেজগুলির সহায়তা পাওয়া দুঃসাধ্য। আমাদের মনে হয়, আজকাল সর্বক্ষেত্রেই যখন ক্রমেই বিজ্ঞানের প্রভাব বাড়ছে, তখন

সাহিত্য গবেষণার সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান শাখার পরীক্ষাগার ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটা প্রচেষ্টা থাকা উচিত।

স্বাধীন গবেষণার ক্ষেত্রে—বিশেষ করে গবেষক যখন উপযুক্ত ডিগ্রীধারী নন, সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্লিপ্ততা কিংবা তুচ্ছতাবোধ থেকে দৃষ্টিভঙ্গীকে ফিরিয়ে নেওয়া উচিত। এই সব গবেষক কিন্তু কোনো ডিগ্রী বা চাকরির উন্নতির জন্য সে-কাজ করছেন না। এঁরা আক্ষরিক অর্থেই সৎ গবেষক।

এই জাতীয় গবেষকদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু করণীয় দিক থাকতে পারে। গবেষকরা অন্ততঃ, এঁদের জন্য পরিকল্পিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিশেষ পর্ষদের কাছে তাঁদের কাজের সংবাদ পৌঁছে দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁদের পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। তাঁরা গবেষণার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেতে পারেন। তাঁদের গবেষণা উপযুক্ত বিবেচিত হলে তা প্রকাশ করতে পারেন। আংশিক ভাবে মূল্যবান হলে পর্ষদের নোট সহ তা সংরক্ষণ করা যেতে পারে। যাঁরা ভালো কাজ করেছেন তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে বিশেষ ধরনের একটি সার্টিফিকেট দেওয়া যেতে পারে। এতে গবেষণার বিষয়ে উৎসাহ দান একটি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকবে না। গবেষণা হচ্ছে মানব জাতির সেবা,—অধ্যাপনায় সুবিধা পাওয়ার হাতিয়ার মাত্র নয়;—বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্ততঃ সেই মানসিকতা আমরা প্রত্যাশা করি। এই জাতীয় স্বাধীন গবেষকরা যে সমস্ত সুচতুর খ্যাতি ও সুবিধা প্রত্যাশী শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতারিত হন, তাঁদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে উপযুক্ত মর্যাদা পেতে পারেন।

আমাদের সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা আছে। এই সমস্যাগুলি থেকে উত্তরণের ভূমির ওপরেই সাহিত্য-গবেষণার পদ্ধতিগুলির প্রয়োগ যথাযথভাবে সম্পন্ন হতে পারে। তাই সাহিত্য-গবেষণার পদ্ধতি ও প্রয়োগ সম্পর্কিত আলোচনা গ্রন্থে এই অধ্যায়টি একটি সাময়িক সংযোজন মাত্র।

১১: সাহিত্য গবেষণার শিরোনাম

সাহিত্য-গবেষণার বিষয় ও শিরোনাম সম্পর্কে সতর্কতার অভাব অনেক সময় গবেষক ও পরীক্ষক—উভয় পক্ষকেই বিব্রত করতে পারে। আমাদের প্রচলিত গবেষণা কর্মের বিষয় সর্ব ক্ষেত্রেই যে গবেষণাধর্মী, একথা হয়তো নিশ্চিতভাবে বলা চলে না। তবে গবেষণার বিষয় শিরোনামের অনুসারী হবে, এটাই প্রত্যাশা করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রমসাধ্য, অথচ শিরোনামের সঙ্গে তার সঙ্গতি শিথিল, এ সব ক্ষেত্রে পরীক্ষকরা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যান। তত্ত্বাবধায়কের অনুমতি সাপেক্ষে শিরোনাম পরিবর্তন করা চলে সেক্ষেত্রে—যেক্ষেত্রে বিশেষ কারণে বা বিশেষ আকর্ষণে গবেষককে পথ পরিবর্তন করতে হয়।

গবেষণার শিরোনাম অনেক সময় দেখা যায় গতানুগতিক ধরনের হয়ে থাকে। '—' শতকের / বাংলা সাহিত্যে '—'। সাহিত্যের পরিবর্তে সাহিত্য শাখার নাম থাকে। আবার কোথাও বা, 'বাংলা '—' সাহিত্য। এই পথ ধরে মাঝে 'বাংলা সাহিত্যে হাঁস', 'বাংলা সাহিত্যে গাড়ী' ইত্যাদি শিরোনাম না হলেও সমগোত্রীয় শিরোনামের কিছু অকেজো গবেষণাও সম্পন্ন হয়েছে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তারিখ-ভিত্তিক ভাবে রেজিষ্ট্রীকৃত গবেষকের গবেষণার শিরোনামগুলি নথিবদ্ধ করা হয়। এগুলি বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়েই আছে। সকলে সম্মিলিত ভাবে যদি অর্ধবাৎসরিক বা বাৎসরিক হিসেবে একটি তালিকা নোট সহ প্রকাশ করেন, তাহলে বিষয় নির্বাচন ও শিরোনাম নির্বাচনে গবেষকরা সহায়তা পাবেন। প্রয়োজন,—পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ এবং অন্য রাজ্য বা রাষ্ট্রে ক. এতদিনের জমে যাওয়া তালিকা—সম্পন্ন অসম্পন্ন ইত্যাদি নোট সহ খ. চলমান রেজিষ্ট্রীকৃত গবেষকের গবেষণার শিরোনামের তালিকা। এর ফলে গবেষকরা যেমন গবেষণার প্রবাহ জানতে পারবেন, গবেষণাযোগ্য বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে পারবেন তেমনি নামকরণেও যথেষ্ট সহায়তা

পাবেন। পূর্বোক্ত তালিকা বিষয়ের শ্রেণী ভিত্তিক ও উপশ্রেণী ভিত্তিক ভাবেও প্রকাশ করা যেতে পারে—যা আরো বেশি সহায়ক।

সাহিত্য ও সমাজ তথা মানুষ কীসে উপকৃত হবে—সেই সামগ্রিক চেতনা নিয়ে আমাদের সাহিত্য গবেষণা অগ্রসর হলে মঙ্গল। শুধু গবেষকের ডিগ্রী পাওয়াকে প্রাধান্য দিয়ে যে কোনো একটি বিষয়বস্তু ও শিরোনাম অবলম্বনে গবেষণা ব্যক্তিগত উপকার সাধন করলেও তার সামাজিক বা সাহিত্যিক মূল্য সব সময় নাও থাকতে পারে।

পূর্বে উক্ত সম্মিলিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কৃত তালিকা হাতের কাছে না থাকলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সম্পন্ন গবেষণার শিরোনাম এখানে অ্যাওয়ার্ডের তারিখ সহ উল্লেখ করা হলো। " এটি কোনো নির্বাচিত উল্লেখযোগ্য গবেষণার তালিকা নয়। আমাদের সাহিত্য-গবেষণার শিরোনাম সাধারণতঃ কেমন হয়, তার একটা ধারণা দিতে চেষ্টা করা হলো মাত্র।

চৈতন্য চরিতের উপাদান
বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকায় অপ্রচলিত সম্প্রদায়
কাব্যালোক
উনিশ শতকের বাংলা সমালোচনা সাহিত্য
কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ
বাংলা কাব্যে শিব
সমকালীন পাঁচজন কবির আলোকে আধুনিক বাংলা-কাব্যের কয়েকটি প্রবণতা
এরিষ্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব
বাংলার বাউল ও বাউল গান
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য (১৮০০-৫৭)
ভারতীয় সঙ্গীতের মূলসূত্র এবং বাংলা সাহিত্যে উহার প্রভাব ও প্রয়োগ
হাস্যতত্ত্ব ও হাস্যরস
বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞান

বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০)
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের গঠনকৌশল
বাংলা গাথাকাব্য
কৃত্তিবাসী ও তুলসীদাসী রামায়ণের তুলনামূলক আলোচনা
আধুনিক বাংলা ছন্দ ঃ
আদি ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে রূপকল্প
বাংলা উপন্যাসে আধুনিক পর্যায়
ভৌগোলিক, মনস্তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্য
বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার
১৪শ-১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত কামতা-কোচবিহার রাজদরবারের সাহিত্য
স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য
ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সমাজ ও গিরিশচন্দ্রের নাটক
ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসনে সমাজচিত্র
রবীন্দ্রকাব্যের আঙ্গিক
বাংলা শিশু রম্যসাহিত্যের ধারা
বাংলা নাটকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব
মহিলা রচিত অর্ধশতকের বাংলা সাহিত্য (১৯০০-৫০)
বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি
যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়
ধর্মঠাকুর ও ধর্মসাহিত্যের বিবর্তন
বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব
প্রাচীন কবিওয়ালার গান
বাংলায় খ্রীষ্টীয় চিন্তা ও অন্যান্য সাহিত্য
বাংলা নাটকে গান
বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখকবর্গ (১৮০০-৫০)

বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের বিভিন্ন প্রবণতা ও উহার সমীক্ষা (১৯১৪-৩৯)

ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা সাহিত্যিক

বাংলায় শেক্সপীয়রের অনুবাদ সমীক্ষা (১৯শ পর্যন্ত)

বাংলা গদ্যভাষার বিবর্তন (১৮৮৮-১৯০০)

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধকালে সংস্কৃত সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ ধারা (১৮৫০-১৯০০)

বাংলা কাব্যে চলিত ভাষা

লৌকিক শব্দকোষ

বাংলা সাহিত্যে সনেট

ঊনবিংশ শতাব্দীর মসীযুদ্ধ

বিশ শতকের ত্রিশ বছরের বাংলা সাহিত্য (১৯১৫-৪৫)

পরবর্তী বাংলা কবিওয়ালার গান

রবীন্দ্রকাব্যে রূপকল্প

রবীন্দ্র নাটক ও পাশ্চাত্য নাট্য জিজ্ঞাসা

রবীন্দ্র সঙ্গীতে বাক্‌শিল্প

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে লৌকিক ঐতিহ্য

রবীন্দ্র শব্দকোষ

বাংলা সাহিত্যে সৌন্দর্যতত্ত্ব

রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব চিন্তার বিবর্তন

বাংলা মঙ্গলকাব্যের লোকসাহিত্যগত ভিত্তি সম্পর্কে অধ্যয়ন।

আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দের তুলনামূলক আলোচনা

শরৎচন্দ্র ও তারাশংকরের তুলনামূলক বিচার

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ব্যঙ্গসাহিত্য

শরৎচন্দ্রের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা

স্বাধীনতা পরবর্তী বাঙ্গালী সমাজের বিবর্তন ও বাংলা উপন্যাসে তার প্রতিফলন

ছন্দঃতত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন

রবীন্দ্রকাব্যে চিত্রকল্প

উপরি-উক্ত শিরোনামগুলির সঙ্গে গবেষকের নাম উল্লেখ অহেতুক মনে করেই তা থেকে বিরত হতে হলো। যেহেতু এক জায়গায় ছেদ টানতেই হয়, তাই তারিখের দিক থেকে আর বেশি অগ্রসর হওয়াও বাহুল্য বলে বোধ করছি।

---

১২. তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব

অ্যাকাডেমিক গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষকের গবেষণার কাজে বিভিন্ন সময়ে তত্ত্বাবধানের জন্য একজন ব্যক্তি নির্দিষ্ট থাকেন। তিনি গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক বা সুপারভাইজর নামে চিহ্নিত। এই তত্ত্বাবধায়কের অধীনে গবেষক তাঁর গবেষণার কাজ শেষ করতে চেষ্টা করেন। বিভিন্ন সংস্থা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বও নির্দিষ্ট থাকে। তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব ও যোগ্যতা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ ও স্বয়ং তত্ত্বাবধায়কের সচেতনতার অভাব অনেক সময় গবেষকের কাজ বিঘ্নিত করতে পারে।

তত্ত্বাবধায়ক নিম্নোক্ত পাঁচটি কাজে গবেষককে সহায়তা করে থাকেন।—

১. **পদ্ধতি শিক্ষায় সহায়তা**
২. **তথ্য আহরণে সহায়তা**
৩. **গবেষককে উৎসাহ দান**
৪. **গবেষকের ত্রুটি সংশোধনে সহায়তা**
৫. **বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগে সহায়তা করা**

তাছাড়া গবেষণা জমা দেওয়া সংক্রান্ত নিয়মকানুনের ক্ষেত্রেও তত্ত্বাবধায়ক সহায়তা করে থাকেন।

প্রথমেই তত্ত্বাবধায়কের যোগ্যতা সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। শুধু মাত্র শিক্ষাগত ডিগ্রী বা বিশেষ ধরনের পদপ্রাপ্তি তত্ত্বাবধায়কের একমাত্র যোগ্যতা হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে না। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যিনি পুঁথি সম্পাদনার মাধ্যমে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রাপ্ত এবং প্রাচীন সাহিত্যের চর্চায় অভ্যস্ত ব্যক্তি, তিনি অতি আধুনিক সাহিত্যের কোনো একটি জটিল বিষয়েও অনায়াসে তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য এ সব ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়কের রক্ষণশীল ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর নির্দেশ তাঁর সঙ্গে গবেষকের মতভেদ আনে। অনেক সময় গবেষক অসহায় হয়ে পড়েন।

সাহিত্যের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি ইত্যাদি

বিচিত্র বিষয়ের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। এ সব ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়কের জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা অনেক সময় গবেষকের প্রসঙ্গগত ত্রুটি নির্দেশে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

মনে হয়, তত্ত্বাবধায়কের যোগ্যতা নির্ধারণ ছাড়াও কোন্ বিষয়ক গবেষণা কোন্ তত্ত্বাবধায়কের অধীনে সম্পন্ন করতে হবে, সে বিষয়েও কর্তৃপক্ষের নির্দেশ থাকা উচিত।

তত্ত্ববধায়কের মধ্যে অনেক সময় একটি কম্‌প্লেক্স কাজ করে। গবেষকের প্রতি তাঁদের সহায়তার মানসিকতার বদলে অনেক সময় কর্তৃত্ব করবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে অনেক সময় গবেষককে, মানসিক অশান্তি ভোগ করতে হয়। গবেষককে তথ্য আহরণের জন্য বা অন্যান্য পরামর্শ গ্রহণের জন্য অনেক সময় বাধ্য হয়েই অন্য কোনো বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী এক বিষয়ের চর্চাকারী অন্য বিষয়ের গবেষণায় যখন তত্ত্বাবধায়কের কাজ করেই থাকেন, সেক্ষেত্রে গবেষণার স্বার্থে গবেষককে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই হয়। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, তত্ত্বাবধায়কের কাছে পূর্বে সম্মতি চাইতে গেলে পাওয়া যায় না। কারণ তাঁরা তা তাঁদের পক্ষে মর্যাদা হানিকর বলে মনে করেন। না জানিয়ে যোগাযোগ করতে গিয়ে অনেক গবেষক তিরস্কৃতও হয়েছেন। তত্ত্বাবধায়ককে এ বিষয়ে গবেষণার স্বার্থে অনেক উদার হতে হবে। অনেক সময়ে এও দেখা যায় যে, কোনো ব্যক্তির কাছে গবেষকের ঋণ গ্রহণ সত্ত্বেও তা অস্বীকার করতে গবেষক বাধ্য হন তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশে।

যখনই তত্ত্বাবধায়ক কোনো গবেষকের দায়িত্বগ্রহণ করবেন, তখন সেই গবেষকের গবেষণা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ থাকা উচিত। ব্যক্তিগতভাবে গবেষণার প্রকৃতি পদ্ধতি তথ্য আহরণের সন্ধান ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর একটু চিন্তাভাবনা করা উচিত। এতে গবেষকরা উপকৃত হবেন। নইলে পথ-নির্দেশে বিভ্রান্তি এসে যেতে পারে—যাতে গবেষকরা ক্ষতিগ্রস্তই হবেন।

আধুনিক কালে গবেষণায় নিষ্ঠার বদলে ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্য বড়ো হয়ে দেখা দেওয়ায় অনেক গবেষক তত্ত্বাবধায়ককে *প্রলোভিত* করার চেষ্টা করেন। এসব ক্ষেত্রে তাঁর প্রলোভন জয় করা উচিত। আবার তত্ত্বাবধায়কের পক্ষ থেকেও গবেষককে প্রলোভিত করা অনুচিত। গবেষক ও তত্ত্বাবধায়ক সুবৃহৎ মানবসেবার ক্ষেত্রে অন্যতম কর্মী হিসেবে কাজ করছেন, এই আদর্শবোধ উভয় পক্ষেরই থাকা উচিত।

অনেক সময় তত্ত্ববধায়ক নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য দুর্নীতি করে থাকেন এবং পরীক্ষকের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে এজন্য যোগাযোগও করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে এইসব কাজ গবেষণার মান নামিয়ে দেয়। আবার বিপরীত ব্যাপারও ঘটে থাকে। কোনো গবেষকের কাছ থেকে অব্যাহতি পেতে অনেক সময় তত্ত্বাবধায়ক নিম্নমানের গবেষণাকে জ্ঞাতসারে জমা দেবার জন্য রেকমেণ্ড করেন এবং নির্বাচিত অন্যান্য পরীক্ষকদের কাছে তাঁর আসল উদ্দেশ্য জানিয়েও দেন। এসব ক্ষেত্রে গবেষকের সঙ্গে তত্ত্বাবধায়কের খোলাখুলি কথাবার্তা হওয়া দরকার।

গবেষক মহলে 'গুরুদক্ষিণা' নামে একটি শব্দ প্রচলিত আছে। যে সব গবেষক কোনো তত্ত্বাবধায়কের কাছে গবেষণা করেন, অনেক সময় তাঁরা তত্ত্বাবধায়কের কোনো গ্রন্থ রচনায় সহায়তা করেন, তত্ত্বাবধায়কের নামে স্কুল কলেজের ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ লিখে দেন। এমন কি কুৎসিতকতকগুলি অভিযোগও পাওয়া যায়। তত্ত্বাবধায়ক এভাবে গবেষকের মূল্যবান সময় অনেক নষ্ট করে থাকেন। অথচ গবেষক তাঁর থিসিসের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়কের প্রতি একান্ত নির্ভর হওয়ায় সেসব কাজ করতে বাধ্য হন। তত্ত্বাবধায়কের উচিত গবেষকের গবেষণার ক্ষেত্রে শ্রম হ্রাসে সহায়তা করা, অকারণ শ্রম বৃদ্ধি ঘটানো নয়।

রাজনৈতিক মতভেদ তত্ত্বাবধায়কেব সঙ্গে গবেষকের ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারে। যে সব ক্ষেত্রে উভয়ের রাজনৈতিক মতবাদ উভয়ের কাছে স্পষ্ট, সে সব ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়কের পক্ষ থেকে উদাসীনতা

৯. বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার সংগ্রহের তালিকা (বর্ণনাত্মক হলে উত্তম) একত্র ভাবে যে কোনো একটি সংস্থায় থাকা উচিত। যে কোনো সংগ্রহের তালিকা ও সংযোজন এই সংস্থায় পাঠানো বাধ্যতামূলক, এমন একটি আইন থাকা উচিত।

১০. সাহিত্য ও অন্যান্য কলা বিভাগের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে। এ অবস্থায় বিজ্ঞান-কলেজের সঙ্গে কলা বিভাগীয় কলেজের ঘনিষ্ঠতা থাকা উচিত। এতে গবেষক যে কোনো বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের সহায়তা অতি সহজে নিতে পারবেন।

১১. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রিকৃত মৃত থিসিস, সম্পন্ন থিসিস, ব্যর্থ থিসিস ইত্যাদির তালিকা একত্র করে একটি তালিকা নোট সহ প্রণয়ন করা উচিত। এই তালিকা প্রণয়নের কাজ শেষ হলে প্রতি বছরের সংযোজন পৃথক পৃথক গ্রন্থে প্রকাশ করা উচিত।

১২. অপ্রকাশিত টাইপ করা গুদাম-বন্দী থিসিসগুলি পাঠের জন্য পৃথক পাঠাগার একত্র কোথাও অথবা প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি থাকা উচিত।

১৩. বিভিন্ন লাইব্রেরীতে **Readers' Guidance** ও **Referral Service** বাস্তবায়িত করা দরকার।

১৪. বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্জীভুক্ত গবেষকদের জন্য অনুবাদ পরিষদের ব্যবস্থা থাকা উচিত প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই এবং অন্ততঃ প্রধান কয়েকটি ভাষার ক্ষেত্রে। তাহলে লেখ্যভাবে না হলেও অন্ততঃ মৌখিকভাবে গবেষকের প্রয়োজনের ভিত্তিতে সহায়তা পাওয়া যেতে পারে।

১৫. উপযুক্ত ডিগ্রীহীন স্বাধীন গবেষকদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশেষ বিভাগ থাকা দরকার এই বিভাগে থাকা উচিত পরামর্শদাতা কমিটি এবং পদ্ধতি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা। এই জাতীয় গবেষণার গুরুত্বের মূল্যায়নও থাকা উচিত।

১৬. গবেষণায় দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগ প্রমাণিত হলে গবেষক, তত্ত্বাবধায়ক বা পরীক্ষক,—তা তিনি বিশিষ্ট-অবিশিষ্ট, স্ব-রাজনীতিক ভিন্ন রাজনীতিক,—যেই হোন না কেন, শাস্তি হিসেবে তাঁকে প্রদত্ত পূর্ববর্তী ডিগ্রী ফিরিয়ে নেওয়া উচিত।

১৭. বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পক্ষ থেকে একক বা সম্মিলিতভাবে সাধারণ স্বার্থে টীমের মাধ্যমে গবেষণার একটি ক্ষেত্র থাকা উচিত।

তাছাড়া বর্তমান গ্রন্থে বিচ্ছিন্নভাবে প্রসঙ্গতঃ আরও কিছু প্রস্তাব হয়তো রয়ে গেছে।

———

১৪. উপসংহার

সাহিত্য গবেষণার পদ্ধতি ও প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে প্রধানতঃ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই করা হয়েছে। এতে কিছু পদ্ধতির কথা আছে—যেগুলি আমাদের কাছে খুব একটা অপরিচিত নয়। গবেষণার কার্যক্রমে কোন্ পদ্ধতি কী ভাবে প্রয়োগ করা যায়, তার একটা ধারণা গবেষকের কাছে সবচেয়ে বেশি দামী। অন্যান্য দেশের গবেষকদের জন্য গবেষক সহায়ক সার্ভিসগুলি সক্রিয়। এদেশে তা স্বপ্নজগৎ বলে মনে হলেও, সেই স্বপ্নের স্পর্শও এই বইয়ে একটু আছে। বর্তমান গ্রন্থকার হয়তো স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন। গবেষণার ভিত্তিতে রয়েছে সামগ্রিক স্বার্থ, কারো ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধ নয়। অন্ততঃ সাহিত্য-গবেষণার পরিবেশ যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, উঁচু আদর্শ সামনে রাখতে ক্ষতি কী?

আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী এমনই যে, সাহিত্য-গবেষণা 'আন্‌প্রডাকটিভ' এবং কল্পনা-বিলাসের সমগোত্রীয় বলে মনে হয়। তাই বিজ্ঞান ইত্যাদি অন্য কিছু শাখার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয়, সাহিত্য শাখার ক্ষেত্রে তার কিছুই প্রায় হয় না। রাষ্ট্রভাষা হওয়ার সুযোগে শুধু একটি ভাষার সাহিত্য-গবেষণাতেই যথেষ্ট উদারতা দেখি। তার পাশে বাংলা সাহিত্য-গবেষণার প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো।

পদ্ধতির বই সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী নিতান্তই পুঁথিগত। 'শিল্পের জন্য শিল্প' নামে একটা মত আছে, এবং ঐ মতটির পাশাপাশি শিল্পের উদ্দেশ্য নিয়ে অন্যান্য মতও আছে। কিন্তু পদ্ধতির উদ্দেশ্য নিয়ে, মনে হয়, এখানে সকলে যেন একটি মতেই বিশ্বাসী,—'মেথডের জন্য মেথড'। তাই আমাদের সব বিষয়ের এবং সর্বস্তরের মেথডের বইগুলি হয়ে পড়েছে প্রকারান্তরে কম্পিউটার ভিত্তিক বিদেশী মেথডের বইয়ের অনুবাদ-বিশেষ। এদেশের জমির সঙ্গে সেগুলির যেন কোনো সম্বন্ধ নেই। তার ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো আর একটা জিনিস চেপে বসে থাকে, সেটা হচ্ছে উৎকট পরিভাষা। বর্তমান

গ্রন্থে অনেকক্ষেত্রে ইচ্ছা করেই ঐ সব পরিভাষা ত্যাগ করা হয়েছে। যেমন ধরুন, রিসার্চের ব্যাপারে বাইরের থেকে পাওয়া সার্ভিসকে 'সেবা' বা 'পরিষেবা'—যা-ই দিন না কেন, ঐ কথা কি আমরা বাইরে কথাবার্তায় ঐ অর্থে ব্যবহার করে থাকি? একটা কেমন যেন কৃত্রিমতা এসে যায়। শুধু পদ্ধতি সংক্রান্ত পরিভাষার কথা বাদ দিলেও কলমের ডগায় আপনা থেকেই যে ইংরেজি শব্দগুলি এসে গেছে, সেগুলিকে 'জাতীয়' করতে গিয়ে ভাষার মৃত্যু ঘটাতে চাই নি। এই অনুযোগ আসবে ভেবেই কথাটা বলে রাখলাম।

বর্তমান গ্রন্থে জটিল পদ্ধতির আলোচনা নেই। কম্পিউটার-ভিত্তিক জটিল পদ্ধতি প্রয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ যখন সৃষ্টি হবে, তখন সেই সব জটিল পদ্ধতি ও প্রয়োগ সম্পর্কে বই লেখার লোকেরও অভাব হবে না,—যদিও বর্তমান গ্রন্থের গ্রন্থকার জটিল পদ্ধতি সংক্রান্ত একটি বইয়ের অমার্জিত ও অর্ধসমাপ্ত একটা খসড়া করে রেখেছেন মাত্র। তবে বর্তমান গ্রন্থে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ও বাস্তব পরিবেশে কিছু পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, যাতে মেথডের জন্য মেথড,—গবেষকের এই নৈরাশ্যবাদ দূরীভূত হয়ে পদ্ধতি ব্যবহারের দিকে আগ্রহ বাড়ে।

পদ্ধতি-গ্রন্থের গ্রন্থকাররা সাধারণতঃ তুচ্ছ দিকগুলি অবহেলা করে উঁচুর দিকে তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। বর্তমান গ্রন্থকার কিন্তু অতি সাধারণ বা তুচ্ছ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতেও সঙ্কুচিত হন নি। অনেক তুচ্ছ জিনিসও আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। গবেষককে বইয়ের পাতা ওল্টানোর পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া অহেতুক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু পাতা ওল্টানোর দোষে বা বদ অভ্যাসে বইগুলি যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এটা বাস্তব সত্য এবং তা অস্বীকার করে লাভ কী? গবেষককে ঘাঁটতে হয় প্রচুর দুষ্প্রাপ্য বই। তাঁদের জানা উচিত, এদেশে সংরক্ষণের ব্যাপারে এমনিতেই অর্থসঙ্কোচ ও আমলাতান্ত্রিক কার্পণ্য রয়েছে। কিন্তু গবেষক কেন নিজে এই ধ্বংসলীলার দায়ভাগ বহন করবেন?

আমাদের এখানকার সাহিত্য-গবেষণার ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে হয়তো কিছু অপ্রিয় প্রসঙ্গ এসে গেছে। সেখানে গ্রন্থকার নীরব থাকতে পারেন নি। পদ্ধতি সংক্রান্ত বইয়ে হয়তো এসব না থাকলেই ভালো হতো। কিন্তু গবেষণার পরিবেশ যদি দূষিত থাকে তাহলে সাহিত্য-গবেষণার উন্নতি ঘটবে কী করে? ঐ উদ্দেশ্য নিয়েই তো পদ্ধতি-শিক্ষার আয়োজন। তাছাড়া পদ্ধতি-প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে যে অসুবিধা রয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব যদি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়, তবে যাঁরই গাত্রদাহ হোক না কেন, আমাদের দেশের সাহিত্য-গবেষণার কাজের ক্ষেত্রে লাভ ছাড়া ক্ষতি হবে না। বিভিন্ন পক্ষের বিভিন্ন অনুচিত কাজের ইঙ্গিত দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, তা সেই গোষ্ঠীর সকলেরই গৃহীত বা গ্রহণীয় আচরণ।

বর্তমান গ্রন্থকার অ্যাকাডেমিক গবেষণার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কাছে করণীয় কিছু বিষয়ের জন্য সুপারিশ করেছেন। তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন যে, তাঁর অধিকারের বাইরে তিনি পদক্ষেপ করছেন। এক্ষেত্রে তাঁর বিনীত নিবেদন এই যে, তিনি শুধু তাঁর ইচ্ছাকেই এখানে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন।

বস্তুতঃ এই গ্রন্থটির মাধ্যমে তিনি তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে শুধু নথিভুক্ত করে গেছেন মাত্র। 'গবেষণা'র ওপরে গবেষণার কাজে—কে জানে এই নথি কাজে আসবে কিনা!

আমাদের সাহিত্য-গবেষণার পদ্ধতি ও প্রয়োগ সম্পর্কিত প্রথম গ্রন্থ হিসেবে এতে যে পূর্ণতা থাকতে পারে না, তা অন্য সকলে যেমন জানেন, স্বয়ং গ্রন্থকারও তা আরো ভালো করেই জানেন। আগামী দিনে নতুন নতুন গ্রন্থকার সাহিত্য গবেষণার পদ্ধতি ও প্রয়োগের ওপরে আরো ভালো, আরো পূর্ণ, আরো সুন্দর বই লিখবেন। বর্তমান গ্রন্থকার শুধু ভিতটুকু তৈরী করে দিয়ে এবং আগামী দিনের সাহিত্য-গবেষকদের আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছেন।

ডঃ জয়ন্ত গোস্বামীর গবেষণা-গ্রন্থ সমূহ

১. সমাজ-চিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন

প্রকাশ-কাল ১৯৭৪ সাল। ডি-ফিল গবেষণা (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৬৪)। সমাজ-দলিল; উনিশ শতকের বাংলা প্রহসন সম্পর্কিত **প্রথম** গবেষণা এবং উক্ত শতকের বিলুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় যাবতীয় বাংলা প্রহসনের সুবৃহৎ আকর-গ্রন্থ।

২. বাংলা পথ-সাহিত্য : পথ-পুস্তিকা

প্রকাশ-কাল ১৯৮২ সাল। ৬/৮/১০ পাতার অতি ক্ষীণায়তন পুস্তিকাগুলি সংরক্ষণের অনিচ্ছায়, আলোচকবর্গের অবহেলায় ও বিভিন্ন কারণে বিলুপ্ত বা লুপ্ত-প্রায়। এই গ্রন্থে সেগুলির স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতীয় ভাষার Street Literature ও Street Booklets সম্পর্কে **প্রথম** গবেষণা। ক্যাটালগিং ও মূল্যায়ন।

৩. সাহিত্য-গবেষণা : পদ্ধতি ও প্রয়োগ

প্রকাশ-কাল ১৯৮৯ সাল। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত গবেষণার বিষয়ে মেথডের **প্রথম** বই। নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গ্রন্থকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচলিত ও তদুদ্ভাবিত নতুন নতুন পদ্ধতিসমূহ ও সেগুলির প্রয়োগ-রীতি তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব পরিকল্পনায় বিন্যস্ত। করেছেন। গবেষণা-জগৎ সম্পর্কে আনুষঙ্গিক কিছু আলোচনা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

[শেষোক্ত গ্রন্থ দুটি কোনো ডিগ্রালাভের উদ্দেশ্যে লিখিত নয়। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত—'পাঠক-পরিধিতে বৃত্তিভেদের প্রভাব'। চলমান : 'সাহিত্যতত্ত্বে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত'। সম্ভাব্য পরিকল্পনা—সাহিত্য-গবেষণায় বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম, ক্ষেত্র-নির্বাচন ও ক্ষেত্রের রূপ গঠন পদ্ধতি'।]

—অধ্যাপিকা মঞ্জুলা বেরা

গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়